Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া সুলতানা

রোলঃ 227021447

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীর ভূমিকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাদিয়া সুলতানা

রোলঃ 227021447

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাদিয়া সুলতানা, আইডিঃ 227021447 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীর ভূমিকা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

নাদিয়া সুলতানা

আইডিঃ 227021447

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা

মানব সভ্যতা নারী এবং পুরুষ এই দুই অংশ নিয়েই গঠিত। ইসলাম পূর্ব যুগে সমাজে নারীদের কোন সম্মান, মর্যাদা, অবস্থান ইত্যাদি কিছুই ছিল না।ইসলাম নারীকে সম্মানের অধীনে অধিষ্ঠিত করেছেন। নবী (সা) এর কাছে সাহাবীরা প্রশ্ন করল, সম্মান করব কাকে? রাসুল (সা) উত্তর দিলেন মা কে। সাহাবীরা আবার প্রশ্ন করল সম্মান করব কাকে? রাসুল (সা) বললেন মা কে। তৃতীয় বারেও একই প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) একই জবাব দিলেন। চতুর্থ বারে বললেন বাবার কথা।

এই সম্মান, মর্যাদা ইসলাম এমনি এমনি নারীকে দেয় নাই। দিয়েছে সমাজে তার অবস্থান এবং অবদানের জন্য।

নিম্নে ইসলামে নারীর কি ভুমিকা, অবদান তা খতিয়ে দেখা যাক

প্রথম অধ্যায়: ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তীতে নারী

ইসলামপূর্ব যুগে নারী

আমরা দেখব ইসলাম আসার পূর্বে কোন ধর্মে বা কোন সভ্যতায় নারীর অবস্থান কিরূপ ছিল।

হিন্দুস্তানে নারী

হিন্দুস্তানের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের 'মনু সংহিতা'য় পিতা, স্বামী কিংবা দু'জনের মৃত্যুর পর পুত্রহীন নারীর স্বতন্ত্র-ব্যক্তিগত কোনো অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। আর পিতা, স্বামী ও পুত্র; এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোনো এক পুরুষ-আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে থাকা আবশ্যক ছিল। সে কোনো অবস্থাতেই তার নিজের ব্যাপারে স্বাধীন ছিল না। জীবিকার ক্ষেত্রে তার অধিকার-বঞ্চনার চাইতেও বেশি নির্মম ছিল স্বামীর বিয়োগপরবর্তী জীবনে বেঁচে থাকার অধিকারের সামাজিক অস্বীকৃতি। সমাজ মনে করত স্বামীর মৃত্যুর পর তার আর বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর দিন 'সতীদাহ'ই (স্বামীর চিতায় পুড়ে মরা) ছিল এমন নারীর অবধারিত নিয়তি। এই প্রাচীন রীতি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার সেই আদিকাল থেকে সতেরো শতক পর্যন্ত বহাল ছিল। এরপর বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের আপত্তির মুখে এর বিলুপ্তি ঘটে।

হামুরাবী আইনে নারী

হামুরাবী আইনে (যার জন্য ঐতিহাসিক বাবেল নগরী প্রসিদ্ধ ছিল) নারীকে গৃহপালিত পশুর ঊর্ধ্বে মনে করা হত না। এই নারীর অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কেউ যদি কারো কন্যাকে হত্যা করত তা হলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিহত কন্যার বাবার হাতে হত্যাকারীর নিজের কন্যাকে আজীবনের জন্য হস্তান্তর করতে হতো। নিহতের বাবা তাকে হত্যা করবে না মাফ করবে নাকি তাকে তার দাসী-বাঁদি হিসেবে রেখে দেবে সেটা ছিল তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। অবশ্য প্রতিশোধ হিসেবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হত্যাই করা হতো।

প্রাচীন গ্রিকসভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রিকসভ্যতায় নারী ছিল সব ধরনের অধিকার এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। তাদেরকে স্বল্পসংখ্যক জানালাবিশিষ্ট এমন বিশাল ঘরে রাখা হতো, যা হত রাস্তা থেকে অনেকদূরে।

উপরন্তু ঘরের দরজায় পাহারাদার নিযুক্ত থাকত। ঘরের স্ত্রী এবং অন্যান্য নারীর প্রতি নিরাসক্তির কারণে গ্রিসের বড়ো বড়ো শহরগুলোতে এমন নাচগানের আসর ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল, যেখানে সুন্দরী নর্তকী ও বাইজিদের মাধ্যমে মনোরঞ্জন করা হত। ধর্মীয়ভাবে ঐ সকল আসরে পুরুষের সঙ্গে নারীদের গমনের তেমন কোনো অনুমতি পাওয়া যেত না। এমনিভাবে দর্শন ও দার্শনিকদের আসরেও নারীর আসন ছিল শূন্য। কর্মজীবী নারী আর দাসী-বাঁদিদের মতো শরীফ ঘরানার নারীদেরও সমাজে বিশেষ কোনো সুখ্যাতি সম্মান জুটত না।

রোমান সমাজে নারী

প্রাচীন রোমানদের নিকট নারী ছিল কতকটা সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের মতোই। অর্থাৎ নারীকে তার বাবা, স্বামী আর পুত্রের অধীনস্থ হয়েই থাকতে হত। রোমান সভ্যতার উৎকর্ষের যুগেও তাদের ধারণা এমন ছিল যে, তাদের (নারীদের) কোনোভাবেই স্বাধীনতা দেওয়া যাবে না। তবে রোমানসভ্যতায় নারী ওই সময় স্বাধীন হতে পেরেছিল যখন রোমান ক্রীতদাসরা বিদ্রোহ আর অসহযোগ আন্দোলন করে গোলামির জিঞ্জির ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। তখন নারীদেরও দাসত্বে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মিশরীয় সভ্যতায় নারী

প্রফেসর আব্বাস মাহমুদ আলআক্কাদ প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতায় নারীর অধিকার এবং স্বাধীনতার আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন, ইসলামের পূর্বে মিসরীয় সভ্যতা এবং তার প্রায় সব আইনকানুন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

। সন্ন্যাসবাদী আদর্শ নারীকে অপবিত্র মনে করত। মধ্যযুগে এই সন্ন্যাসবাদেরই জয়জয়কার ছিল। খ্রিষ্টীয় পনেরো শতক পর্যন্ত গির্জার পুরোহিতগণ এই মর্মে গভীর অনুসন্ধান আর গবেষণা চালায় যে, আসলে নারী কি আত্মাহীন দেহ নাকি তাদেরও আত্মা আছে, যার সঙ্গে মুক্তি ও বিনাশ সম্পৃক্ত হতে পারে! ওই সময় অধিকাংশের অভিমত ছিল, নারী মুক্তি পেতে পারে এমন আত্মাশূন্য। এক্ষেত্রে ঈসা মসীহের কুমারী মাতা মারিয়ামই কেবল ব্যতিক্রম। রোমানদের এই উত্থান-পরবর্তীকালে মিসরীয় সভ্যতায় নারীদের অবস্থানের ক্ষেত্রে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মিসরীয়দের উপর রোমানদের অত্যাচারের তীব্রতা তাদের দুনিয়াবিমুখতার কারণ হয়। ফলে অনেকেই এই সন্ন্যাসবাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ এবং শয়তানের ধোঁকাবাজি থেকে (যেখানে নারীই ছিল সর্বশীর্ষে) দূরে থাকার একমাত্র উসিলা মনে করত।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন কিতাবের শিক্ষা অনুপাতে পিতার পুত্র আছে বলে কন্যারা পিতার মিরাস থেকে বঞ্চিত হত।

উত্তরাধিকার সম্পদের বিধান ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত পুত্রসন্তান (যত নিচের স্তরের হোক) জীবিত থাকবে ততক্ষণ কন্যা তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর এই নিয়মে মিরাস পেলেও কন্যা অন্যকোনো খান্দানে বিয়ে করার কোনোভাবেই সামাজিক অনুমোদন পেত না এবং প্রাপ্ত মিরাস অন্যকোনো খান্দানে হস্তান্তরেরও তার কোনো অধিকার ছিল না। এই হুকুম প্রচলিত তাওরাতে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়।

হেজাজ ভূমিতে নারী

হেজাজ অর্থাৎ জাযিরাতুল আরবেও নারীদের কোন সম্মান, মর্যাদা ছিলনা। এর অনেক অঞ্চলে নারীর প্রতি বৈষম্য ও অত্যাচার সারা দুনিয়ার চেয়ে বেশি ছিল। আবার কোন অঞ্চলে স্বামী গৃহে নারীর প্রতি একটু ভালো ব্যবহার করা হত এই কারনে যে সে ছিল কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির কন্যা অথবা গৃহস্বামীর আদরের সন্তানের মা।

আর ঐ সমাজে পিতা, স্বামি, ভাই এবং পুত্র এরা সবাই তাকে মালিকানাধীন অন্যান্য বিষয়-সম্পত্তির মতোই রক্ষনাবেক্ষন করত।

নারীরা ঐ সমাজে গবাদিপশু ও অন্যান্য জীবজন্তুর মতোই হস্তান্তর হত। কেউ কেউ লজ্জার কারণে নিজের কন্যা সন্তানকে শৈশবেই জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে দিত।আর যারা কন্যাকে জীবিত রাখত সে নারী হত তাদের দৃষ্টিতে উত্তরাধিকার সম্পত্তি, যা পিতার মৃত্যুর পরে পুত্রের হাতে অর্পিত হত

চীনে নারী

মি. স্ট্রেচি প্রাচীন চীনে নারীর অবস্থান জানাতে গিয়ে লেখেন, সুদূর প্রাচ্যে অর্থাৎ চীনে নারীর অবস্থা ও অবস্থান খুব ভালো ছিল না। ছোট্ট ছোট্ট নারী শিশুদের পায়ে বেড়ি-কাঠ বা লোহার জুতো পরানোর প্রথার উদ্দেশ্যও ছিল তাদেরকে দুর্বল ও শক্তিহীন করে রাখা। এই প্রথা যাদিও সমাজের উচ্চশ্রেণি এবং বিত্তবানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল কিন্তু এর দ্বারা আসমানী হুকুমতের প্রাক্কালে নারীদের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে অনেকটাই আঁচ করা যায়।

ইংল্যান্ডে নারী

উপরিউক্ত প্রবন্ধকার ইংল্যান্ডে নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন, সেখানে নারীকে সব ধরনের নাগরিক সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত। তার জন্য শিক্ষার দরজা বন্ধ ছিল। নিম্নশ্রেণির কিছু কাজকর্ম ছাড়া নারী ভালো কোনো পেশায় নিযুক্ত হতে পারত না। বিবাহের সময় তার সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। বলা হত মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত নারীকে যে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এরচেয়ে ভালো কিছু তখন আশা করা যেত না।

ইসলামে নারী

আমরা দেখব ইসলাম আসার পর নারীর অবস্থান কিরুপ। পূর্বোক্ত আলোচনায় দেশ, সভ্যতা ও ধর্মের আলোকে নারীর অবস্থান থেকে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে নারীর ন্যূনতম সম্মান টুকুও দেওয়া হয়নি, সেখানে ইসলাম নারীকে কি মর্যাদা দিয়েছে তা নিম্নরূপ

একমাত্র ইসলামই এসব বৈষম্যমূলক আইন এবং ইন্যান্য অনৈতিক রুসম-রেওয়াজ এবং পুরুষের আত্মম্ভরিতা ও অহংবোধের কবল থেকে রক্ষার জন্য নারাকে যথার্থ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। কুরআনে কারীমের উপর যদি একবার সাধারণভাবে নজর বুলানো সম্ভব হয় তা হলেও নারীর ব্যাপারে সেসব অজ্ঞ-মূর্খের অমূলক ধ্যানধারণা এবং ইসলামের উচ্চতম উদার দৃষ্টিভঙ্গির আকাশ পাতাল ব্যবধান বোঝার জন্য যথেষ্ট হবে। কুরআনের যেসকল আয়াত মানবসভ্যতার অর্ধাঙ্গিনীর জন্য নাযিল হয়েছে, নারীদের মধ্যে তা এ কারণেই নির্ভরতা ও আস্থা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে যে, এগুলো তাদেরকে তাদের সামাজিক দৃঢ় অবস্থান এবং আল্লাহর কাছে তাদের যে অনন্য মর্যাদা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে দেয়। এবং এর আলোকে সে দীন, ইলম ও ইসলামের খেদমত, কল্যাণ ও খোদাভীতিমূলক কাজে সহায়তা এবং চরিত্রবান সমাজ বিনির্মাণে পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে পারে। কুরআনের আয়াতে আমলের কবুলিয়াত, মুক্তি, সৌভাগ্য ও আখেরাতের সফলতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সব সময় পুরুষের সঙ্গে নারীকেও স্পষ্ট উচ্চারণে শামিল করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُون
الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِير

“পুরুষ হোক বা নারী, কেউ নেক আমল করলে এবং মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার উপর বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।” (সুরা আন নিসা, আয়াত ১২৪)

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْث
بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْض

“অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে কোনো সৎকর্মশীলের আমল বিফল করি না; সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ।” (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৫)

এমনিভাবে উত্তম জীবনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং উপায়-উপকরণ প্রদানের ক্ষেত্রেও পুরুষের সঙ্গে নারীকে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্মরণ করা হয়েছে। বরং তার জন্য বিশেষ নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। আর হায়াতে তাইয়েবা এমন ব্যাপক ও গভীর অর্থবহ শব্দ, যা আদর্শিক সফল জীবনের সীমাহীন প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও ইজ্জত শামিল করে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيُوةٌ طَيِّبَةً و َ
لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون(َ

"নেক আমল যেই করুক, সে পুরুষ হোক বা নারী, সে যদি মুমিন হয় তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং তাদেরকে তাদের সৎকর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" (সুরা নাহল, আয়াত ৯৭)

সিফাতে হাসানা, আমালে সালেহা এবং দীনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের আলোচনার সময় কুরআন মজীদ পুরুষদের সাথে সাথে নারীদের কেবল উল্লেখ আর এই ইঙ্গিতই করে না যে, নেক আমল আর উত্তম গুণাবলির ক্ষেত্রে নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। বরং এরকম প্রতিটি গুণ এক এক করে আলাদা আলাদাভাবে ও খুলে খুলে বর্ণনা করে। আর যখন পুরুষদের ঐসব গুণ বর্ণনা করে তখন ঐ গুণগুলোর সঙ্গে নারীদের অভিষিক্ত করে, তাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে ব্যক্ত করে; যদিও এর জন্য আলোচনা বেশ দীর্ঘও করতে হয়।

এর মূল রহস্য হল, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে শক্ত-সমর্থ পুরুষদেরকে নারীদের উপর কিয়াস করতে ঐ সকল মানবীয় মেধা প্রস্তুত নয়, যারা অনৈসলামিক ধ্যানধারণা, দর্শন এবং প্রাচীন সমাজসভ্যতার ছত্রচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছে। এসকল মেধা সব সময় নারী আর পুরুষের মধ্যে একটা পার্থক্যরেখা টেনে রাখতেই ভালোবাসে এবং তাদেরকে অনেক মর্যাদাপূর্ণ বিষয়ে অংশীদার হওয়া থেকে কৌশলে বঞ্চিত রাখে। সুতরাং কীভাবে তারা ঐসকল ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগিতামূলক অংশগ্রহণকে মেনে নেবে! আপনারা আমার সঙ্গে এই আয়াত তেলাওয়াত করুন,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمْتِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَ الْقُنِتِينَ وَالْقُنِتْتِ وَ
الصَّدِقِينَ وَالصُّدِقْتِ وَ الصُّبِرِينَ وَالصُّبِرْتِ وَ الْخُشِعِينَ وَ الْخُشِعْتِ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقتِ
وَ الصَّابِمِينَ وَالصُّمْتِ وَالْحُفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَ الحفظتِ وَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّكِرْتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا

عظيمان

“অবশ্যই মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সাওম পালনকারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী- তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।” (সুরা আহযাব, আয়াত ৩৫)

কুরআন মজীদ শুধু ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রেই তাদের এমন উল্লেখ করে না বরং যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষ আলেম-ওলামা, দৃঢ়চেতা ব্যক্তি, ধর্মীয় ও চারিত্রিক পরীক্ষা, আমর বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার তথা সৎকাজের আদেশ আর অসৎকাজে নিষেধের পথে যারা নানারকম কষ্ট-নির্যাতন বরদাশত করে তাদের সঙ্গে তাদের আলোচনা উল্লেখ করে এবং মুমিন মুমিনাতকে কল্যাণ ও তাকওয়ার কাজে এক অভিন্ন জামাতরূপে দেখতে পছন্দ করে। কুরআনে কারীমের ইরশাদ লক্ষ করুন,

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولٰئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী-তারা একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পরে নেক কাজের আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাযের পাবন্দি করে, যাকাত আদায় করে, আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করে। তারাই ঐ সকল লোক, যাদের উপর আল্লাহ রহম করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।” (সুরা আত তাওবা, আয়াত ৭১)

এবং জাত-বংশ ও রক্ত-বর্ণ সবকিছুকে ছাপিয়ে তাকওয়া ও পরহেযগারিকেই মানবমণ্ডলীর সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসনে আসীন হওয়ার জন্য একমাত্র মানদণ্ড মনে করে। কুরআনের ঘোষণা,

يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَ انْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“হে লোকসকল, আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে

পার। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানী ঐ ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। সবকিছুর খবর রাখেন।” (সুরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

এগুলো নারীদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতা তৈরি করে। এগুলো আধুনিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাদেরকে হীনম্মন্যতা থেকে বাঁচাতে সহায়তাও করে বটে।

ইসলামের এসকল শিক্ষার ফলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষক, প্রশিক্ষক, সেবক, লেখক, সাহিত্যিক, কুরআনের হাফেজ, হাদিসের রাবী, ইবাদতগুজার-সাধক এবং সমাজের মধ্যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন নারী সত্তার এমন এক বিশাল সংখ্যা লক্ষ্য করা যায়, যাদের থেকে ইলমী ইসতিফাদা করা হয়, দীক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং এদের সকলেই আদর্শিক ও পথিকৃৎ ব্যক্তিত্বের ধারক ও বাহক ছিলেন।

ইসলাম নারীর যেসকল অধিকার নিশ্চিত করেছে এগুলোর মধ্যে মালিকানা, উত্তরাধিকার, কেনাবেচার অধিকার, বিবাহের অধিকার, প্রয়োজনে খোলার (স্বামী থেকে বিচ্ছেদ চেয়ে নেওয়া) অধিকার, রাজি না-থাকলে শৈশবের বাগদান খতম করার অধিকার, দুই ঈদ-জুমআ ও অন্যান্য নামাযের জামাতে অংশগ্রহণের অধিকার, দরস-তাদরিস এবং দীনের প্রচারপ্রসারে অংশগ্রহণের অধিকার উল্লেখযোগ্য।

ইসলামে নারীর ভূমিকা

দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাকৃতিক বিষয়

প্রাকৃতিক বিষয়

একজন নারী সমাজে যে অবদান রাখে তার সবকিছুই তার নিজের হাতে থাকে না। কিছু জিনিস আছে যা আল্লাহ প্রদত্ত। যাকে আমরা প্রাকৃতিক বিষয় বলে অবহিত করি। কিছু জিনিস যা কেবল মাত্র নারীদের দ্বারাই সম্ভব। যেমন- সন্তান জন্মদান, সন্তান প্রতিপালন, পরিবার দেখাশোনা ইত্যাদি। একজন নারী ছাড়া সন্তান জন্মদান কখনোই সম্ভব নয়। এখানে পুরুষের দরকার আছে কিন্তু পুরো বিষয়টাই একজন নারীর সাথে সম্পৃক্ত। নারী ছাড়া সন্তান জন্মদান কখনোই সম্ভব নয় । তেমনি সন্তান প্রতিপালন, পরিবার দেখাশোনা ইত্যাদি নারী ছাড়া অসম্পূর্ণ। এগুলো আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব যা নারীর উপর অর্পিত হয়েছে।

সন্তান জন্মদানে নারী:

সন্তান জন্মদানে নারী যে ভূমিকা রাখে পুরুষ সেটা পারে না। একজন নারী দীর্ঘ নয় মাস সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে সন্তান জন্ম দেয়। আল কুরআনে 'মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি (কেননা) তার মা কষ্টের পর কষ্ট সয়ে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু’ বছরে তুমি শোকর আদায় কর আমার এবং তোমার পিতা-মাতার। আমারই কাছে (তোমাদেরকে) ফিরে আসতে হবে।(সুরা লুকমান ৩১:১৪)’

সন্তান গর্ভধারনের সময় একজন মা থাকে খুবই নাজুক। একজন মায়ের শরীর গর্ভধারনের সময় শিশু তার মায়ের খাবার দ্বারাপরিচালিত হয়।গর্ভধারনকারী মায়ের খাদ্য- খাবার শিশুর পরিপুষ্ট হতে সাহায্য করে। মায়ের নাড়ির সাথে শিশুর নাড়ির সরাসরি সংযোগ থাকার ফলে মায়ের যাবতীয় খাদ্য তার শরীরে শক্তি সঞ্চারকের -ভূমিকা পালন করে। শিশু শুধুমাত্র মায়ের খাবার দ্বারাই পরিপুষ্ট হয় না বরং এর পাশাপাশি শিশু তার মায়ের চিন্তাচেতনা দ্বারাও পরিপুষ্ট হয়। মায়েরর যাবতীয় চিন্তা-চেতনা ও ভাবনা শিশুর মানসিক ও বুদ্ধির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ পালন করে। সন্তান গর্ভে থাকাকালেই মায়ের মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শিশু তার মায়ের হাসি-কান্না, দুঃখ বেদনা, তার লালিত বোধ বিশ্বাস ইত্যাদির উপর প্রভাবিত হয়

সন্তান প্রতিপালনে নারী

সন্তান প্রতিপালনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিসীম। সন্তানকে সুস্থ, সঠিকভাবে বড় করার জন্য নারীর নানা দিক থেকে অবদান অত্যাবশ্যক। এটি শুধু শারীরিক বা মানসিক দিকেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং নৈতিক মূল্যবোধে অবদান রাখার মাধ্যমে সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যত গঠনেও প্রভাব ফেলে। নারীর ভূমিকা সন্তানের জীবনে বিভিন্ন পর্যায়ে এবং নানা দিক থেকে দেখা যায়।

সন্তান প্রতিপালনে নারীকে একজন মালীর সাথে তুলনা করা যায়। মালী যেমন বাগানে গাছের পরিচর্যা করে একটি কি ক্ষুদ্র বীজ একটি পরিপূর্ণ গাছে পরিণত করে তেমনি একজন মা একটি ভ্রূণ থেকে একটি পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি করেন। মালী যেমন নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে সব ধরনের বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা থেকে একটি ছোট্ট চারা গাছ কে আগলিয়ে রাখে তেমনি একজন নারী, একজন মা তার শিশু বাচ্চা টাকে সবধরণের বিপদ- আপদ, খারাপ ছোয়া থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

১. শারীরিক যত্ন:

গর্ভাবস্থা: মা হিসেবে, একজন নারী প্রথমেই সন্তানের শারীরিক বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের দিকে মনোযোগ দেন। গর্ভাবস্থায় মা সন্তানের শারীরিক এবং মানসিক বিকাশে সহায়ক নানা পদক্ষেপ নেন, যেমন—সঠিক খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত বিশ্রাম, নিয়মিত চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যপরীক্ষা।

প্রথম ৬ মাসে বুকের দুধ খাওয়ানো: মাতৃদুগ্ধ একটি শিশুর প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টির উৎস। মায়ের দুধে শিশুদের জন্য অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান থাকে যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়ক।
শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর গুরুত্ব, শৈশবের নিবিড় সম্পর্ক ও প্রথম অনুরাগ। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

'যে তার সন্তানের দুধ পানের সময়-কাল পূর্ণ করতে চায়, সে ক্ষেত্রে মায়েরা পুরো দু-বছর নিজেদের সন্তানদের দুধ পান করাবে। ...' (সূরা বাকারাহ ২ : ২৩৩)

শিশুকে বুকের দুধ পান করানো নারীদের গর্ভাবস্থার একটি বর্ধিত অংশ। বিভিন্ন গবেষণায় এ বিষয়টি বহুবার উঠে এসেছে যে, বুকের দুধই শিশুর জন্য সবচেয়ে উপকারী। আর বৈচিত্র্যময় শারীরিক উপকারিতা নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বুকের দুধ পান করানোর মাধ্যমে মা ও শিশু উভয়ে মানসিক ও শারীরিকভাবে উপকার লাভ করেন। এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'বন্ডিং' (বন্ধন) বা 'অ্যাটাচমেন্ট'। এটি সন্তান প্রতিপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রভাবক। একারণে ইসলামে বুকের দুধ পান করানোর প্রতি দারুণভাবে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বস্তুত এটি শিশুর মৌলিক অধিকার।

২. মানসিক ও মানসিক সহায়তা:

প্রেম ও শাসন: সন্তানের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য মায়ের ভালোবাসা ও স্নেহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মা সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষিকা হন, তারা প্রথম থেকেই ভালো-মন্দ, সঠিক-ভুল বুঝতে শেখান এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শাসন করেন।

মনের যত্ন: সন্তানদের মানসিক সুরক্ষা দেয়ার জন্য মা তাদের কথা শোনেন, আবেগ বুঝে তাদের পাশে থাকেন এবং তাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করেন।

৩. শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ:

প্রাথমিক শিক্ষা: সাধারণত, সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষা, যেমন—ভাষা শেখানো, আচার-ব্যবহার, এবং অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান প্রদানে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মায়ের কাছ থেকেই সন্তান প্রথমে পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা পায়। সন্তান তার মায়ের কাছেই প্রথম কুরআন পড়তে শেখে। ঈমান, আকিদা, ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে মায়ের কাছেই শিশু প্রাথমিক ধারণা পায়। আল্লাহ সম্পর্কে , আল্লাহর গুনাবলী সম্পর্কে একজন মা তার সন্তানকে খুব ভালো ভাবে বুঝাতে পারে। সন্তান তার মাকেই সবচেয়ে বেশি ভরসা করে, বিশ্বাস করে। তাই একজন মায়ের পক্ষে খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী সম্পর্কে জানানো সহজ হয়।

সামাজিকীকরণ: মায়েরা সন্তানদের সামাজিক মূল্যবোধ, নৈতিকতা, এবং জীবনযাপনের অভ্যাস শেখান। তাদের মধ্যে সৎ, দায়িত্বশীল, সহযোগিতামূলক এবং দয়ালু মনোভাব গড়ে তোলেন।

৪. ভবিষ্যৎ গঠন:

সামাজিক এবং কর্মজীবনের প্রস্তুতি: মায়েরা সন্তানদের আত্মবিশ্বাসী এবং সৃজনশীল হতে উৎসাহিত করেন। তারা সন্তানদের শিক্ষা, ক্যারিয়ার গঠন, এবং জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নিতে সহায়ক হন। একজন মা তার সন্তানের জীবনে অনেক বড় প্রভাব বিস্তার করে। সন্তান যেকোনো হাসি-হাসি-কান্না তার মায়ের সাথেই আগে ভাগাভাগি করে নেয়। সন্তানের ভালো মন্দ বিচার করে খুব সহজেই মা তার সন্তানকে সঠিক পরামর্শ দিতে পারে।

স্বাস্থ্য সচেতনতা: মায়েরা সন্তানের শারীরিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্যের দিকেও গুরুত্ব দেন। সঠিক খাওয়ার অভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা সম্পর্কে শেখান। মায়েরা শিশুদেরকে ছোট বয়স থেকেই সময়ানুবর্তিতা শেখান। একজন মুসলিম মা তার সন্তানকে সকালে ঘুম থেকে উঠিয়ে নামাজ পড় শেখান, কুরআন পড়া শেখান। আবার সন্তান যেন রাতের বেলা দ্রুত ঘুমিয়ে পরে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন।

৫. অর্থনৈতিক এবং শারীরিক সহায়তা:

মায়ের অর্থনৈতিক অবদান অনেক ক্ষেত্রে সন্তানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গৃহস্থালী কাজ, কর্মজীবন এবং পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে সন্তানদের জীবনমান উন্নত করতে মায়ের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

৬. সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ:

একজন মা তার সন্তানকে নিজের সংস্কৃতি, ধর্ম, এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে। এটি সন্তানের পরিচয় গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ভবিষ্যতে তাকে একটি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনে পরিণত করতে সাহায্য করে।

সন্তান প্রতিপালনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিভিন্ন স্তরে বিস্তৃত। মা শুধুমাত্র শারীরিক এবং মানসিকভাবে সন্তানের যত্ন নেন না, বরং তাদের নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় তৈরি করতে সাহায্য করেন। মায়ের হাতেই সন্তানের ভবিষ্যত এবং চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি থাকে। এই ভূমিকা সব সময় সশ্রম এবং অপরিসীম, যা সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর অবদানের গুরুত্বকে প্রতিফলিত করে।

সংসার ধর্ম পালনে নারীর ভূমিকা

সংসার ধর্ম পালনে মুসলিম নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সংসার একজন নারীর ফিতরাত হিসাবে বিবেচনা করা যায়। নারী এবং পুরুষের কাজ আলাদা। শারীরিক মানসিক দিক দিয়ে নারী এবং পুরুষ দুইজন সম্পূর্ণ আলাদা। একজন পুরুষ যে ধরনের কাজ করতে পারে একজন নারীর পক্ষে তা করা কঠিন এমনকি অনেক সময় তা অসম্ভব। এজন্যই ইসলাম নারী- পুরুষের কাজ আলাদা আলাদা করে দিয়েছে। নারী কাজ করবে ঘরের ভিতরে আর পুরুষ কাজ করবে ঘরের বাহিরে। পুরুষ কঠিন এবং ভারি কাজ করবে, নারী তুলনামূলক সহজ কাজ করবে। ইসলামে নারীকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির অংশ হিসেবে দেখা হয়, যিনি পরিবার ও সমাজের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করেন। সংসার ধর্ম পালনে নারীর দায়িত্ব শুধুমাত্র গৃহস্থালি কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং সন্তান লালনপালন, পিতা-মাতার খেদমত, ইবাদাত, ইসলামের দাওয়া ইত্যাদির মধ্যেই সংসার হয়ে থাকে।

১. পরিবারে নারীর ভূমিকা:

ইসলামে পরিবারকে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং এখানে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী মা, বোন, স্ত্রী, মেয়ে রুপে সংসারে আগলিয়ে থাকেন। পরিবারে শান্তি, সুখ, এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নারীর অবদান অপরিসীম। পরিবারে প্রত্যেকের কাজ আলাদা করা থাকলেও পরিবারের প্রধান নারী সদস্য সবার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করেন।

মা হিসেবে ভূমিকা: ইসলাম মা-কে সবচেয়ে সম্মানিত স্থান দিয়েছে। একবার সাহাবীরা রাসুল (সা) এর কাছে প্রশ্ন করলেন অধীক সম্মানের হকদার কে? রাসুল (সা) জবাব দিলেন মা। পুনরায় একই প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) সাহাবিদের একই জবাব দিলেন। তৃতীয়বারেও একই প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) একই জবাব দিলেন। চতুর্থ বারে রাসুল (সা) সাহাবিদের বললেন বাবার কথা। রাসুল (সা) এর হাদিস থেকে জানা যায় মা হিসাবে একজন নারীর মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। একজন মা তাঁর সন্তানকে নৈতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষা, এবং মানবিক গুণাবলী শেখান। তাঁর মাধ্যমে সন্তানের মধ্যে ঈমান এবং নৈতিকতা গড়ে ওঠে, যা পরবর্তীতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। মাকে সন্তানের প্রথম মাদ্রাসা হিসাবে অবহিত করা হয়েছে এবং সন্তানের প্রথম শিক্ষিকা মা কে বলা হয়। একজন মা তার সন্তানকে যেরূপ ধর্মীয় আবহে গড়ে তুলতে পারে তা অন্য কেও পারে না। মায়ের কাছেই শিশু প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। পরিবারের নারী সদস্যের কাছে শিশু সকল নৈতিক, ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা পায়।

স্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব: একজন স্ত্রীর দায়িত্ব শুধু স্বামীর সেবা করা নয়, বরং সংসারে শান্তি, ভালবাসা এবং সহযোগিতা বজায় রাখা। স্ত্রী হিসাবে একজন নারী শুধু তার স্বামীর সেবাই করে না বরং তার শারীরিক মানসিক সব বিষয়ে খেয়াল রাখে। একজন বিদ্যান, জ্ঞানী নারী তার স্বামীর ভুল ত্রুটিগুলো শুধরে দিয়ে তাকে ধর্মীয় আবহে গড়ে তোলে। ইসলাম নারীকে স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির আদেশ দেয়। একজন মুসলিম স্ত্রী পরিবারে ন্যায়, সুশৃঙ্খলা এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্ত্রী হিসাবে একজন নারী শুধু তার স্বামীর সেবাই করে না বরং পরিবারের বাকি সদস্যদেরও খেয়াল রাখে, তাদের সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। একজন নারীর সকল আচার আচরণ সবসময় ইসলামকে উপস্থাপন করে।

২. ধর্মীয় দায়িত্ব পালন:

ইসলামে পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা ও কার্যক্রম চালানোর জন্য নারীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিম নারী তার সংসার ধর্ম পালন করতে গিয়ে নিজের এবং পরিবারের ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করেন। একজন নারী যেভাবে ধর্মীয় বিষয় গুলো নিজের ভিতরে ধারণ করে তা একজন পুরুষ এর পক্ষে সম্ভব নয়। নারী সারাদিন ঘরের ভিতরে থেকে তার প্রতিটি কাজে কুরআন- সুন্নাহ এর সাথে থাকতে পারে যা পুরুষের জন্য কঠিন।এইজন্য নারী কে পরিবারের সবাইকে ধার্মিক হতে মেহনত করতে হয়।

নামাজ ও রোজা: মুসলিম নারী পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি পরিবারে একটি ধর্মীয় পরিবেশ তৈরি করেন, যাতে পরিবারের সদস্যরা ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করতে পারে। পরিবার কে বলা হয় মাদ্রাসা আর মা তার প্রধান শিক্ষিকা। পরিবার নামক মাদ্রাসায় নারী সদস্যরা তাদের সন্তানদের সঠিক তালিম দেন। নারী তথা মায়েদের সঠিক তরবিয়ত তার সন্তানদের নেককার, তাক্বওয়াবান, সচ্চরিত্র হিসাবে গড়ে তোলে। মায়েদের কারণেই সন্তানেরা শিশু বয়স থেকেই নামাজ, রোজা পালন করে থাকে। মায়েরা বিভিন্ন উৎসাহ মূলক কথাবার্তার মাধ্যমে সন্তানদের মধ্যে অতি সহজেই ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রাখে।

যাকাত এবং দানশীলতা: মুসলিম নারীরা নিজের এবং পরিবারের দানের মাধ্যমেও সমাজে সহানুভূতি এবং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করেন। যাকাত, সাদাকা এবং দানশীলতা ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ দাতব্য কার্যক্রম এবং এটি পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। নারীরা সাধারণত দান সাদাকা করতে পছন্দ করে। তাদের কাছে যে যৎসামান্য অর্থ থাকে তা তারা সাদাকা করে অথবা ভালো কাজে ব্যয় করে।

৩. সংসার পরিচালনায় দক্ষতা:

মুসলিম নারীরা সংসার পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ হন। তাঁরা নিজেদের ঘরকে একটি সুন্দর, শৃঙ্খলিত এবং সুস্থ পরিবেশে পরিণত করেন। গৃহস্থালি কাজ যেমন রান্না, বাচ্চাদের যত্ন, সংসারের অন্যান্য কার্যক্রমে মুসলিম নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা: ইসলামে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রয়েছে। যদিও স্বামী অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব পালন করেন, তবে স্ত্রীর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রয়েছে। একজন নারী তার পিতা, স্বামী ও ছেলের অর্থের হকদার। নারী পরিবারে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সংসারের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়তা করেন। সংসারের সকল দায়িত্ব নারী নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পুরুষকে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করে।

পরিবারের সুস্থতা: নারীরা পরিবারের সদস্যদের শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে খাদ্য, স্বাস্থ্য এবং জীবনধারা পরিচালনার মাধ্যমে সহায়তা করেন। পরিবারের কোন সদস্য অসুস্থ হলে নারীই তার দেখাশোনা, সেবা- শুশ্রূষা করে থাকে। নারী রোগিকে সেবা দানের মাধ্যমে আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। অসুস্থ কে সেবা করা নারী ইবাদাত মনে করে।

৪. পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন:

একজন মুসলিম নারী সংসারে সম্পর্কের উন্নয়ন ও সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কাজ করেন। তিনি কেবল স্বামী এবং সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, বরং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক তৈরি করেন। এটি সংসারে শান্তি এবং সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। সংসারে কোন ঝামেলা হলে একজন নারী খুব দায়িত্বের সাথে তা মুকাবিলা করে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে সে দ্বীনের পথে দাওয়াত দেয়।

মার্জিত আচরণ: ইসলাম নারীদের সহনশীলতা, মার্জিত আচরণ, এবং সুখী সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়। একজন নারী পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিরোধের সমাধানে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। মার্জিত আচরণের দ্বারা নারী সবার কাছে সম্মানের পাত্রী হয়ে থাকে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি: একজন নারী তার সন্তানদের ছোট বয়স থেকেই ধর্মীয় শিক্ষা দেন। মা কে শিশুর প্রধান শিক্ষিকা বলা হয়। শিশুর নৈতিক শিক্ষা দিয়ে, ন্যায়পরায়ণতা শিখিয়ে সমাজে চলার উপযুক্ত করে তোলেন।একজন নারী তার সন্তানদের ধর্মীয় আবহে গড়ে তাদের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৫. সামাজিক দায়িত্ব পালন:

মুসলিম নারী শুধু পরিবারে নয়, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সমাজে নৈতিকতা, শান্তি এবং সমতা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করেন।

সামাজিক কর্ম: ইসলাম নারীদের সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে। একজন মুসলিম নারী সমাজের অন্যান্য অসহায়, দরিদ্র, শিশু, ও প্রতিবন্ধীদের সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন। সমাজে মানবিক কাজগুলো তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। নারী দান সাদাকা করে সমাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

উপসংহার:

সংসার ধর্ম পালনে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক এবং গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে শান্তি এবং ধর্মীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়া, এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি সহানুভূতি ও ভালোবাসা প্রদানে মুসলিম নারীর অবদান অপরিসীম। ইসলাম নারীকে সম্মান দিয়েছে এবং তাঁকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সমাজের একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরির সুযোগ দিয়েছে। একজন মুসলিম নারী তাঁর পরিবার এবং সমাজের জন্য একটি আদর্শ উদাহরণ স্থাপন করতে পারেন, যা পরিবার এবং সমাজের উন্নয়নে সহায়ক।

পিতা-মাতার খেদমতে নারী

পিতামাতার খেদমতে মুসলিম নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ইসলামে এটি একটি মহান কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পিতামাতা, বিশেষত মা, ইসলামে অত্যন্ত সম্মানিত স্থান অধিকারী এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সেবা ইসলামের অন্যতম মৌলিক শিক্ষা। মুসলিম নারীরা তাঁদের পিতামাতার খেদমত ও সেবা করার মাধ্যমে শুধু এক পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেন না, বরং তাঁরা ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী নিজের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলেন।

ইসলামে পিতামাতার সম্মান:

ইসলামে পিতামাতা, বিশেষ করে মা, অত্যন্ত সম্মানিত।একদা সাহাবীরা রাসুল (সা) কে প্রশ্ন করলেন সম্মান করব কাকে? রাসুলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন মা কে। সাহাবীরা আবার প্রশ্ন করলেন সম্মান করব কাকে? আবারও রাসুলুল্লাহ (সা) জবাব দিলেন মা কে। তৃতীয়বারেও একই প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) একই জবাব দিলেন। চতুর্থ বার প্রশ্ন করা হলে রাসুল (সা) জবাব দিলেন বাবা কে।কুরআনে পিতামাতার খেদমত এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করার গুরুত্ব বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুরা আল-ইসরা (17:23)-এ আল্লাহ্ বলেন:

وَقَضٰى رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।"

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পিতামাতার খেদমত এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আদেশ।

পিতা-মাতার খেদমতে নারীর ভূমিকা:

মুসলিম নারী পিতামাতার খেদমত করার মাধ্যমে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করেন। বিশেষ করে মায়ের খেদমতকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নারীরা তাদের পিতামাতার সেবা ও সম্মান প্রদর্শন করে পারিবারিক সম্পর্ক শক্তিশালী করেন এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেন।

মা ও পিতার সেবা: মা সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদিসে বলা হয়েছে, "মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে।" (সহিহ আল-নিসা)। অর্থাৎ, মায়ের সেবা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম নারী তাঁর মাকে শ্রদ্ধা ও সেবা করতে এক বিশেষ কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করেন।

পিতার খেদমত: ইসলামে পিতার সেবাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিতা, যিনি পরিবারের প্রধান শীর্ষস্থানীয় সদস্য, তাঁর সম্মান রক্ষা এবং সেবা করা মেয়ে বা স্ত্রীর দায়িত্ব।

আত্মত্যাগের নিদর্শন:

যখন পিতামাতার শারীরিক বা মানসিক দুঃখ-কষ্ট বৃদ্ধি পায়, তখন একজন নারী তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাঁদের সহানুভূতির সঙ্গে খেদমত করেন। বিশেষ করে বয়স্ক পিতামাতার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা একজন নারীর জন্য এক বিরাট সাধনা এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা।

দোয়া ও সেবা:

একজন নারী শুধুমাত্র শারীরিক সেবা প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, তিনি পিতামাতার জন্য দোয়া করা এবং তাদের সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা এই খেদমতের অপরিহার্য অংশ। পিতামাতার জন্য প্রার্থনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এটি সংসারের শান্তি এবং আল্লাহর রহমতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বনি ইসরাঈল 17:24

وَاخۡفِضۡ لَہُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحۡمَۃِ وَقُلۡ رَّبِّ ارۡحَمۡہُمَا کَمَا رَبَّیٰنِیۡ صَغِیۡرًا ؕ

"এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক! তারা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছে, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।"

ইবরাহীম 14:41

رَبَّنَا اغۡفِرۡ لِیۡ وَلِوَالِدَیَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِیۡنَ یَوۡمَ یَقُوۡمُ الۡحِسَابُ

"হে আমার প্রতিপালক! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল ঈমানদারকে ক্ষমা করুন।"

উত্তম আচরণ, ভালো ব্যবহারের মাধ্যমে মা বাবার খেদমত করা অপরিহার্য।

পিতামাতার বয়স বাড়লে তাদের খেদমত আরও কঠিন হতে পারে, কিন্তু ইসলামে তাদের প্রতি সহানুভূতির আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একজন মুসলিম নারী পিতামাতার বৃদ্ধত্ব এবং দুর্বলতা সহ্য করে তাদের সেবা করতে বাধ্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র আল কুরআনে পিতা-মাতার খেদমত করার কথা বলেছেন

وَقَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاہُ وَبِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُہُمَاۤ اَوۡ کِلٰہُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّہُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنۡہَرۡہُمَا وَقُلۡ لَّہُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো, পিতা-মাতার কোনও একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।"

বয়স্ক পিতামাতার সেবা করাটা তাদের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ।

পরিবারে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখা:

মুসলিম নারী তার পিতামাতার খেদমতের মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি ও সুশৃঙ্খলা বজায় রাখে। পিতামাতার জন্য আদর্শ সন্তানের মতো আচরণ করা, এবং তাদের যত্ন নেওয়া সংসারে একটি

সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। পিতা মাতার খেদমত করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য আবশ্যক হলেও নারীরা এক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। পুরুষরা সারাদিন ঘরের বাহিরে কাজ করার ফলে চাইলেও পিতা-মাতার খেদমত করতে পারে না। এক্ষেত্রে নারীদের সাহায্য তাদের একান্ত কাম্য। নারীরা ঘরের কাজ, সন্তান লালনপালন, পিতা-মাতা, শশুর- শাশুড়ীর খেদমত খুশি মনে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকে।

মা- বাবার হক বুঝতে হবে। যে সকাল-সন্ধ্যা মা বাবাকে দেখবে, শুধু দেখা, খেদমত নয়, কুশল জিজ্ঞাসা নয়, তাহলে সকাল- সন্ধ্যায় তার জন্য জান্নাতের দুইটি দরজা খুলে যাবে। মুহাব্বতের সঙ্গে মা-বাবার দিকে তাকালে তার আমলনামায় হজের সওয়াব লেখা হয়। এক বেদুঈন তার মাকে কাঁধে নিয়ে তাওয়াফ করাচ্ছিলো। সে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা-কে দেখে বললো, আমি আমার মায়ের হক আদায় করে দিয়েছি। তার কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর বললেন, তোমাকে লালন-পালন করার সময় তোমার মা যে লম্বা-লম্বা শ্বাস নিয়েছে, সেই লাখ-লাখ শ্বাসের একটি শ্বাসেরও হক তুমি আদায় করো নি।

তৃতীয় অধ্যায়:

জ্ঞান চর্চায় নারীর ভূমিকা

হাদিস চর্চায় নারী

জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে যে কয়েকটা জঘন্য আক্রমন মোকাবিলা করতে করতে হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো- ইসলাম নারীদের ঘরবন্দি করার মধ্য দিয়ে তাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে এবং উপেক্ষা করেছে তাদের অধ্যবসায় এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে।

বস্তুত, ইসলামে স্বাধীনতার সংগা সুনির্দিষ্ট। হোক তা পুরুষের জন্য কিংবা নারীদের জন্য। ইসলাম স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ আলাদা করে সংগা প্রদান করে না। ইসলাম কোন ভাবেই নারীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি বরং দ্বীনি জ্ঞান চর্চাতে যুগে যুগে এত বিপুল সংখ্যক নারীদের অংশগ্রহন ও অবদান পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এ বিষয়ে ইসলামের উপর বিন্দুমাত্র অভিযোগ তুলার সুযোগ নেই। দ্বীনি অঙ্গনে নারীদের সরব উপস্থিতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। নারী পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে জ্ঞান অর্জন করছে। এখানে বাঁধা দেওয়া জন্য কোন ব্যক্তি বা ধর্ম নেই। বরং ইসলাম ধর্মে জ্ঞান অর্জনে নারীদের সবসময় উৎসাহিত করা হয়।

ইসলামি জ্ঞানচর্চার অসামান্য মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন আমাদের নারীরা। যে সিলসিলার সূত্র ধরে আমরা আজকের ইলমি জগতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। এর পেছনে রয়েছেন একদল মহীয়সী মুসলিম নারী। এমনকি জ্ঞানের কিছু কিছু শাখায় নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার কারনেই পুরুষ চিন্তকদের অনেক বিভ্রাট দূর হয়েছে। হাদিস শাস্ত্রের অসংখ্য মৌলিক প্রস্তাবনা ও পদ্ধতি নারীদের তীক্ষ্ম মেধার প্রত্যক্ষ ফসল।

হাদিস অনুসন্ধানকারী ও হাদিসের শিক্ষার্থী হিসেবে নারী

আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, ইসলাম বোঝা ও চর্চার জন্য নারীর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শরিয়াহর কোনো আইনি প্রতিবন্ধকতা নেই; বরং এই কাজ তাদের পুরুষের মতোই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আইন মূলত নিজ থেকে কোনো কিছু বৈধ বলে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, কোনো কিছু নিষিদ্ধও করতে পারে না। আইনের পাশাপাশি আইনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি নৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন হয় বৃহত্তর সামাজিক প্রচেষ্টা। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে ধর্ম সম্পর্কে জানার বিষয়ে নারীদের অভিলাষ পরবর্তী সময়ের খলিফা, শাসক, উলামা ও নেতৃস্থানীয় নারী-পুরুষের মাঝে কীভাবে প্রভাব ফেলেছিল- এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে সে বিষয়ে আলোচনা করব। এ বিষয়ে তারা সফল হয়েছিলেন কাজের প্রতি নিজেদের আন্তরিকতা, ইলম অনুসন্ধানের পথ পরিভ্রমণ ও লজ্জাকে অতিক্রম করার মাধ্যমে। মুখস্থ করার মাধ্যমে এবং লিখিত আকারে হাদিস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় দক্ষতা তারা কীভাবে অর্জন করেছিল, সে বিষয়ে এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করব।

শিক্ষাদানের দায়িত্ব

রাসূল (সা.)-এর প্রাথমিক ভূমিকা ছিল দ্বীনের একজন শিক্ষকের ন্যায়; আইনপ্রণেতা কিংবা শাসকের ভূমিকা নয়। দ্বীনের শিক্ষক হিসেবে আইন কিংবা বিধিবিধানের দরকার হয় শিক্ষাদানের চূড়ান্ত মাধ্যম হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

هُوَ الَّذِىۡ بَعَثَ فِى الۡاُمِّيّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ *
وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍۙ

" তিনি সেই মহান সত্তা, যিনি সাধারণ জনগোষ্ঠীর মাঝ থেকে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন-যিনি তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবেন, তাদের জীবনকে পবিত্র করবেন, তাদের কিতাবের শিক্ষা দেবেন, অথচ এ লোকগুলোই আগে সুস্পষ্ট গোমরাহিতে লিপ্ত ছিল। (সূরা জুমুআ : ২)"

রাসূল (সা.) ও তাঁর পরিবারের ওপর ইসলামকে একটি জীবনধারণ পদ্ধতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মহান দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে দুনিয়ার সাময়িক পাওনার দিকে এবং সংসারের দুঃখ-কষ্ট মেনে না নেওয়ার ক্ষেত্রে একধরনের দুর্বলতা তৈরি হচ্ছিল। ফলে এই বিষয়ে কুরআনে (সূরা আহজাব : ২৮-২৯) সূক্ষ্মভাবে সতর্ক করা হয়।

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দেই। (সূরা আল-আহযাব 33:28)

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا

হে নবী! নিজ স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার শোভা চাও, তবে এসো আমি তোমাদেরকে কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে সৌজন্যের সাথে বিদায় দেই। (সূরা আল-আহযাব-৩৩:২৮)

এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীগণকে দুটো বিকল্প প্রস্তাব থেকে যেকোনো একটি বেছে নিতে বলেন। হয় তাঁরা দুনিয়ার কষ্ট মেনে নিয়ে রাসূল (সা.)-এর সঙ্গে থাকবে এবং পরকালীন প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দেবে, নয়তো তাঁরা দুনিয়াকে বেছে নেবে। দুনিয়াকে বেছে নিলে দুনিয়ায় তাঁদের প্রাপ্ত সম্পদের হকও মিটিয়ে দেওয়ার কথা তিনি বলেন। জাবির (রা.)-এর বর্ণনা থেকে জানা যায়- 'নবিজি প্রথমে আয়িশা (রা.)-কে এই "পছন্দ" বেছে নেওয়ার কথা বলেন। এ বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে; বরং তাঁর পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলেন।

জবাবে আয়িশা (রা.) বলেন- "আমি কি আপনার ব্যাপারে আমার পিতা- মাতার সঙ্গে পরামর্শ করব ইয়া রাসূলাল্লাহ? আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং পরকালকেই বেছে নিলাম। তবে আমার অনুরোধ, আমি কী বলেছি-এ বিষয়ে আপনি আপনার অন্য স্ত্রীগণের সামনে কিছু বলবেন না।" রাসূল (সা.) বললেন-"কেউ আমার নিকট এ বিষয়ে জানতে চাইলে আমি অবশ্যই তাঁদের বলব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুয়ান্নিত (কোনো কিছু কঠিন করে ফেলেন যিনি) হিসেবে কিংবা মুতায়ামিত (অন্যদের ভুলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে যে) হিসেবে পাঠাননি; বরং তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন যেন আমি মানুষদের শিক্ষা দিই এবং তাদের জন্য সবকিছুকে সহজ করে দিই।""

আমরা জানি না, কেন আয়িশা (রা.) রাসূল (সা.)-কে যা বলেছিলেন, তা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন; কিন্তু রাসূল (সা.)-এর প্রত্যাখ্যানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা জানি। একজন মহান শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রথম কাজই মানুষকে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করে-এমন বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করা।

সন্তানদের শিক্ষাদান

সন্তানদের ছেলেবেলার শিক্ষাদীক্ষাই শিক্ষার প্রথম ধাপ। এ কাজটি ভালোভাবে আঞ্জাম দেওয়ার জন্য একটি অতীব জরুরি বিষয় হলো-ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমানভাবে ভালোবাসা। গভীরভাবে গেঁথে যাওয়া আচরণগুলো বদলানোর জন্য প্রয়োজন কিছু প্রচেষ্টা। রাসূল (সা.) বলেন-

'আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। মায়ের অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং মানুষকে কিছু না দিয়ে কেবল নিতে থাকা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত-'তিনি এক লোককে নিজের কন্যার মৃত্যু কামনা করতে শুনলেন। সম্ভবত লোকটি ছিলেন অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে উদ্বিগ্ন। ইবনে উমর (রা.) রাগান্বিত হয়ে বললেন-'তার খাবারের সরবরাহ কি তুমি করো?

উকবা ইবনে আমির (রা.) (মৃত্যু: আনুমানিক ৬০ হি.) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) বলেছেন-

'কন্যা সন্তান থেকে তোমরা বিমুখ হয়ো না। কেননা, তোমাদের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য তারা মূল্যবান সম্পদ।

আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন-

'যাকে আল্লাহ তায়ালা কন্যাসন্তান দিয়ে পরীক্ষা করবেন, তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে।

আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন-

'যে ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দুটো কন্যা সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে, পরকালে সে আর আমি এভাবে থাকব। (এ কথা বলে তিনি হাতের দুটো আঙুল মেলে ধরলেন।)

আবু সাইদ খুদরি (রা.) (মৃত্যু: আনুমানিক ৬৩ বলেছেন- হি.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.)

'যার তিনটি কন্যা অথবা তিন বোন থাকবে, অথবা দুই কন্যা কিংবা দুই বোন থাকবে এবং আল্লাহর ভয় সহকারে সে তাদের উত্তম সঙ্গী হিসেবে থাকবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

রাসূল (সা.)-এর এই শিক্ষা তৎপরবর্তী প্রজন্মেও বিদ্যমান ছিল। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও আইনবিদ আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর পুত্র সালিহ ইবনে আহমাদ বলেন-

'আমার পিতা আহমাদ বিন হাম্বলের একটি কন্যা সন্তান হলে তিনি বললেন-আল্লাহর রাসূল (সা.)-ও কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন। আর কন্যা সন্তানের সঙ্গে (হাদিসে) আছে স্পষ্ট পুরস্কার। পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তানকে সমান দৃষ্টিতে দেখার ব্যাপারে রয়েছে নির্দিষ্ট সুন্নাহ। আল বাজ্জার (মৃত্যু: ২৯২ হি.) আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণনা করেন-

'একদিন রাসূল (সা.)-এর নিকট এক লোক বসে ছিলেন। একসময় লোকটির পুত্র সন্তান এলো। লোকটি তার পুত্র সন্তানকে চুমু দিলেন এবং তার কোলে বসালেন। অতঃপর তার

কন্যা সন্তান এলো, কিন্তু লোকটি কন্যা সন্তানকে তার সামনে বসালেন। রাসূল (সা.) লোকটিকে বললেন- কেন আপনি তাদের দুজনকে সমানভাবে বিবেচনা করলেন না?

রাসূল (সা.) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুদের অন্তরে দ্বীনের জন্য ভালোবাসা গেঁথে দেওয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন। তিনি নিজেও এ কাজ করেছেন; শিশুদের সঙ্গে খেলেছেন, শিশুদের নিজের কাজের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। তাঁর দুই নাতি হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে তিনি নামাজেও নিজের সঙ্গে রাখতেন। এটা সবারই জানা। এখানে আমরা কিছু হাদিস উল্লেখ করছি, যেখানে দেখা যাবে-কন্যা শিশুদেরও রাসূল (সা.) একই রকম স্নেহ করতেন।

খালিদ ইবনে সাইদ তাঁর পিতা থেকে, তাঁর পিতা উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইবনে সাইদ; যিনি বেশ কিছুদিন আবিসিনিয়ায় বসবাস করেছিলেন, তাঁর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- 'আমি আমার বাবাসহ আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর নিকট এলাম। আমি একটি হলুদ রঙের পোশাক পরিহিত ছিলাম। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন-সানা, সানা! আবিসিনিয়ার ভাষায় যার অর্থ সুন্দর, সুন্দর। অতঃপর আমি রাসূল (সা.)-এর কাঁধের নবুয়তের চিহ্ন নিয়ে খেলতে লাগলাম। আমার বাবা আমাকে (এমন কাজের জন্য) তিরস্কার করতে লাগলেন; কিন্তু রাসূল (সা.) বললেন-তাকে খেলতে দাও। অতঃপর তিনি দুআ করলেন, যেন আমার পোশাক দীর্ঘদিন টেকসই হয়। পোশাকটি দীর্ঘদিন টেকসই হয়েছিল।

আবু কাতাদা (মৃত্যু: ৫৪ হি.) বর্ণনা করেন-

'রাসূল (সা.) যখন স্বীয় নাতনি (জয়নব রা.-এর কন্যা) উমামা বিনতে আবুল আস ইবনে আর-রাবিয়াকে নিয়ে বের হতেন, তখন তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন রাসূল (সা.)-এর দরজার সামনে। উমামা ছিল ছোট্ট শিশু। রাসূল (সা.) উমামাকে কাঁধে নিয়ে নামাজের ইমামতি করতেন। রুকু-সেজদার সময় তাঁকে নামিয়ে রাখতেন। রুকু-সেজদা থেকে উঠে আবার তাঁকে কাঁধে নিতেন। এভাবে তিনি পুরো নামাজ সমাপ্ত করতেন।

রাসূল (সা.) কখনো নারীদের নিষেধ করেননি গর্ভজাত কিংবা পালিত শিশুদের নিয়ে মসজিদে যেতে; বরং নারীরা যেন নির্বিঘ্নে মসজিদে উপস্থিত হন, সেটাই নিশ্চিত করতেন। তিনি শিশু ও মায়েদের কথা বিবেচনা করে নামাজ সংক্ষিপ্ত করতেন। সাবিত আল বুনানি আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণনা করেন-'রাসূল (সা.) এক নারীর সঙ্গে থাকা শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। অতঃপর তিনি নামাজে সংক্ষিপ্ত সূরা তিলাওয়াত করেন। '৬৩ কাতাদা (মৃত্যু: ১১৮ হি.) আনাস (রা.) হতে আরও বর্ণনা করেন, নবিজি বলেন-'আমি দীর্ঘ নামাজের ইচ্ছা নিয়েই নামাজ শুরু করেছিলাম, কিন্তু ক্রন্দনরত শিশুর মায়ের মন সন্তানের নিকট যেতে চাইবে ভেবে নামাজকে সংক্ষ্যংক্ষিপ্ত করি।

নারীদের নিজেদের প্রচেষ্টা

সুন্নাহ অনুসরণের অংশ হিসেবে পুরুষ কর্তৃক নারীকে শিক্ষাদানের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এর মানে এই নয়, কেবল স্বামী কিংবা অভিভাবকগণের আগ্রহের কারণেই হাদিসের প্রতি নারীদের আগ্রহ তৈরি হয়েছিল; বরং উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী অন্য কারও অনুপ্রেরণা ছাড়াই একান্ত ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকেই দ্বীনের জ্ঞানচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। সাবিত (রা.) আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন- 'একদিন আবু বকর (রা.) উমর (রা.)-কে ডাকলেন তাঁর সঙ্গে উম্মে আইমানকে দেখতে যেতে। কেননা, রাসূল (সা.) জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে দেখতে যেতেন। গিয়ে দেখলেন, তিনি (উম্মে আইমান) কাঁদছেন। তাঁরা ভাবলেন, রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর কারণে হয়তো তিনি কাঁদছেন) (তাঁরা উম্মে আইমানকে কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন এবং বললেন-"যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, সে সবকিছুই তো তাঁর রাসূলের জন্য উত্তম।" জবাবে তিনি বললেন-"যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে, সে সবকিছুই তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য উত্তম-এটা আমি জানি না, এমন তো নয়। আমি সেজন্য কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি এই জন্য, আরশ থেকে আল্লাহর বাণী আসা বন্ধ হয়ে গেছে।" উম্মে আইমানের এই কথা শুনে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন। '৮৭

রাসূল (সা.)-এর জীবদ্দশায় নবিজির থেকে কোনো কিছু শেখার সুযোগ থেকে নারীরা বঞ্চিত হচ্ছেন কি না, তা ভেবে নারীরা সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতেন। আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে রাফি (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন- 'একদিন তিনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন, নবিজি মিম্বারে উঠে বলছেন-হে লোকসকল! এই কথা শোনামাত্রই তিনি চুল আঁচড়ে দেওয়া নারীকে বললেন, আমার চুল বেঁধে দাও। নারীটি বললেন-আমার সবকিছু আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, নবিজি তো কেবল বলছেন-হে লোকসকল! উম্মে সালামা বললেন-দুর্ভাগ্য তোমাদের! আমরা কি সেই লোকসকলের অন্তর্ভুক্ত নই?'

অতঃপর তিনি চুল বেঁধে ঘরের এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন, যেখান থেকে রাসূল (সা.)-এর কথা শোনা যায়। উম্মে সালামা বলেন-'আমি নবিজিকে বলতে শুনলাম, হে লোকসকল! বিচারের দিনে আমি যখন হাউজে কাউসারের নিকট থাকব, তখন তোমরা দলে দলে সেখানে আসতে থাকবে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। তখন আমি বলব-আমার দিকে এসো। তখন আমার পেছন থেকে একজন আহ্বানকারী চিৎকার করে আমাকে বলতে থাকবে-ওদের যেতে দিন, ওরা আপনার (মৃত্যুর) পর (আপনার সুন্নাহকে) বদলে ফেলেছিল। তখন আমি বলব-দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও!

আদ-দাহহাকের বোন ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) ছিলেন প্রথম হিজরতকারীদের একজন। তাঁর স্বামী ইসলামের প্রথম যুদ্ধে শহিদ হন। তাঁর ইদ্দতের সময় শেষ হতে না হতেই একদিন তিনি আজান শুনে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। তিনি বলেন-

'আমি নারীদের কাতারে ছিলাম। রাসূল (সা.) নামাজ শেষ করে মিম্বারে উঠে বসলেন এবং হাসলেন। অতঃপর বললেন-"সবাই নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করো। তোমরা কি জানো, কেন তোমাদের একত্রিত করেছি?" সকলে বলল-'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-ই অধিক জ্ঞাত।" তিনি বললেন-'আল্লাহর কসম। তোমরা কামনা করো অথবা ভয় পাও, এমন কোনো বিষয়ে বলার জন্য তোমাদের একত্রিত করিনি; বরং তোমাদের একত্রিত করেছি এ কথা শোনার জন্য যে, তামিম দারি নামে একজন আমার এসেছে এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে একজন খ্রিষ্টান ছিল। খ্রিষ্টানবিরোধী যে বিষয়গুলো আমি তোমাদের বলতাম, সে তাঁর সত্যায়নে একটি গল্প বলেছে।" অতঃপর ফাতিমা (রা.) তামিম দারির সম্পূর্ণ গল্প বর্ণনা করেন।'*

এই ঘটনা থেকে ফাতিমা (রা.)-এর জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করার বিষয়টি পরিমাপ করা যায়। মাত্র কয়েকদিন আগের শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই যখন শুনলেন নামাজের পর রাসূল (সা.) খুতবা দেবেন, তখন তিনি মসজিদে গেলেন এবং রাসূল (সা.)-এর বাণী হৃদয়পটে ধারণ করলেন।

জ্ঞান অর্জনের পথে লজ্জা

ঈমানকে পাকাপোক্ত করে পরকালের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার স্বার্থে জ্ঞান অর্জন করতে এবং এর জন্য কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করতে নারীগণ লজ্জাবোধ করে পিছিয়ে যেতেন না। এই বিষয়ে আমরা ইতঃপূর্বে বিভিন্ন উদাহরণ দেখেছি। মুজাহিদ (রা.) বলেন-'লাজুক (মুসতাহয়ি) ও অহংকারীরা (মুসতাকবির) জ্ঞান অর্জন করতে পারে না।

হাফিজ ইবনে হাজার এ বিষয়ে বলেন-'লজ্জা (হায়া) হলো ঈমানের অঙ্গ।

বড়োদের সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য যে লজ্জা, তা বৈধ ও প্রশংসাযোগ্য; কিন্তু কোনো বিধিবিধান জানার পথে যে লজ্জা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তা ভীরুতা ও নীচতা।'

এই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেই মুজাহিদ (রহ.) বলেন-'লাজুকরা জ্ঞান অর্জন করতে পারে না। নারী সাহাবিগণ জ্ঞান অর্জনের পথে কঠোর পরিশ্রমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য উদাহরণ। অন্যরা শুনলে কী মনে করবে, এই ভেবে তাঁরা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতেন না। উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন উম্মে সুলাইম (রা.) রাসূল (সা.)-এর নিকট এসে বললেন-

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কোনো সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না। যদি কোনো নারীর স্বপ্নদোষ হয়, তবে কি তার জন্য গোসল ফরজ হবে?' নবিজি বললেন-'(হ্যাঁ) যদি কিছু নির্গত হতে দেখে, তাহলে ফরজ হবে।' উম্মে সালামা (রা.) মুখ ঢেকে বললেন- 'নারীদেরও স্বপ্নদোষ হয়?' নবিজি বললেন- 'হ্যাঁ। তোমার হাত ধুলোমলিন হোক! (যদি স্বপ্নদোষ না-ই হতো) কীভাবে একটি শিশু কখনো কখনো তার মায়ের মতো হয়?'৯৮

আয়িশা (রা.) একবার বলেন-

'আনসার নারীরা কত সুন্দর! দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে লজ্জা তাঁদের বাধা হতে পারেনি।

হাদিসের সংরক্ষক হিসেবে নারী

একটি হাদিস প্রথমে যেভাবে শোনা হয়, তা অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত কোনো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু সংরক্ষণ করা হলে সেটাকে সহিহ হাদিসের মর্যাদা দেওয়া হয়। সংরক্ষণ বলতে শব্দগুলো যথাযথভাবে শোনা, অর্থ ভালোভাবে উপলব্ধি করা, সে অর্থ সংরক্ষণ, শব্দগুলো হুবহু সংরক্ষণ, দৃঢ়ভাবে তা যাচাই এবং অন্যের নিকট প্রচার করা। এই কাজ দুভাবে হয়-

১. মুখস্থ করার মাধ্যমে এবং

২. লিখে রাখার মাধ্যমে

১. মুখস্থকরণ: সাহাবিগণ তাঁদের উত্তরসূরিগণ এবং পরবর্তী যুগের বিভিন্ন ইমাম ও মুহাদ্দিসদের মাঝে 'মুখস্থকরণ পদ্ধতি' ছিল হাদিস সংরক্ষণের মাধ্যম হিসেবে সবচেয়ে জনপ্রিয়। কারণ, মুখস্থ করা জ্ঞান মানুষের হৃদয়ের অংশ হয়ে যায় এবং মাতৃভাষার মতোই মুখস্থ করা বিষয় জিহ্বার সঙ্গে প্রায় মিশে যায়।

আফফান ইবনে মুসলিম (রহ.) (মৃত্যু : ২১৯ হি.) বলেন-'আমি উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসানের নিকট আল জুরাইরির একটি বই চাইলাম। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন-হিলাল বিন হকের নিকট যাও, তাঁর নিকট আছে। অতঃপর তিনি বললেন, আমি কেবল নিজের মুখস্থ করা জ্ঞান এবং না দেখে উচ্চারিত জ্ঞান থেকেই সরাসরি উপকৃত হয়েছি। আবদুর রাজ্জাক বলেন-'যে জ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গে গোসলখানায় যায় না, সে জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না।' আল আসমায়ি (মৃত্যু: ২১৭ হি.) বলেন-'যে জ্ঞান আমার সঙ্গে গোসলখানায় প্রবেশ করে না, সে জ্ঞান জ্ঞান নয়।

সোনালি যুগের ব্যক্তিদের স্মৃতিশক্তি নিয়ে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা আমাদের নিকট অনেকটা অতিরঞ্জিত বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হতে পারে। আলি ইবনে খাশরাম বর্ণনা করেন, তিনি আশ-শাবির বর্ণনা নিয়ে ইসহাক ইবনে রাহাওয়াহর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তিনি বলেন-

'সাদা কাগজে কোনো কালো অক্ষর লিখলে, সাথে সাথে তা হৃদয়পটেও ধারণ করে নিতাম। কখনো এমন ঘটেনি-কেউ আমার নিকট একটি হাদিস বর্ণনা করেছে, আর আমি দ্বিতীয়বার তাঁকে তা বলার জন্য অনুরোধ করেছি।' অতঃপর ইসহাক আমাকে বলেন- 'তুমি কি এতে অবাক হচ্ছ হে আবু হাসান (আলি ইবনে খাশরামের উপাধি)?' বললাম- 'হ্যাঁ। (তা-ই তো হওয়ার কথা!)' অতঃপর ইসহাক বলল-'তাহলে আমার বিষয়ে তোমাকে বলি। আমি কখনোই কোনো কিছু লিখে রাখি না, সবকিছু হৃদয় দিয়ে শিখে নিই। এখন আমার (হৃদয়ে সাজানো) হাদিসের গ্রন্থের দিকে তাকালে দেখবে, সত্তর হাজারের বেশি হাদিস!

তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন-তাঁর মুখস্থকৃত হাদিসগুলো যেন একটি বইয়ে সাজানো। সেগুলো পড়া শুরু করলে মনে হবে, যেন তিনি বই দেখে দেখে ক্রমান্বয়ে পড়ছেন।

পুরুষদের মতো নারীরাও রাসূল (সা.)-এর হাদিস মুখস্থ করেছিলেন। রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণের পাশাপাশি সাধারণ নারী সাহাবিরাও রাসূল (সা.)-এর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং হৃদয়পটে ধারণ করতেন।

নারী সাহাবিদের অনেকেই অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। আয়িশা (রা.) তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নারী সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হাদিসগুলো যে ছোটো বা সংক্ষিপ্ত ছিল, এমনও নয়; বরং তাঁদের বর্ণিত এমন অনেক হাদিস আছে, যেগুলো অনেক দীর্ঘ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ফাতিমা বিনতে কায়েস (রা.) মাত্র একবার শুনে কীভাবে তামিম দারিসংক্রান্ত একটি হাদিস স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট বর্ণনা করে গেছেন। আত-তাবরানি 'আল আহাদিস আল তিওয়াল' (দীর্ঘ হাদিস সংকলন) সংকলন করেন, যেখানে বহু নারী বর্ণনাকারীর হাদিস সংকলিত হয়েছে।

সাইদ ইবনে মুসাইয়্যিব ছিলেন নবিজির একজন যোগ্য ইলমি উত্তরসূরি। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন হাদিসের জ্ঞান সম্পর্কে অনেক বিজ্ঞ। তাঁর কন্যা তাঁর থেকে সব হাদিস শিখে নেন। আবু বকর ইবনে আবু দাউদ (মৃত্যু : ৩১৬) বর্ণনা করেন, উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান (শাসনকাল : ৬৫-৮৬ হি.) নিজ পুত্র আল ওয়ালিদের সঙ্গে সাইদ ইবনে মুসাইয়াবের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর এক গরিব ছাত্রের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কন্যার স্বামী বলেন-

'সে ছিল অসাধারণ সুন্দরী। কুরআনের ব্যাপারে ছিল অগাধ জ্ঞানের অধিকারীদের মধ্যে একজন। রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ সম্পর্কে ছিল তাঁর সর্বোচ্চ জ্ঞান। আর স্বামীর অধিকার বিষয়ে সে ছিল যথেষ্ট সচেতন।'

আবু নুয়াইম (মৃত্যু: ৪৩০ হি.) সাইদ ইবনে মুসাইয়াবের কন্যার ব্যাপারে বর্ণনা করেন-

'একদিন সকালে তাঁর স্বামী আলখাল্লা গায়ে দিয়ে বের হচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছ? তাঁর স্বামী বললেন, সাইদের সভায় জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। তিনি বললেন, এখানে বসো। আমিই তোমাকে সাইদের জ্ঞান দান করব।

একইভাবে ইমাম মালেকের কন্যা পিতার বর্ণিত সব হাদিস শিখে ফেলেছিলেন। তিনি সেই সময়ের বিখ্যাত হাদিস ও ফিকহগ্রন্থ 'মুয়াত্তা' সম্পূর্ণ মুখস্থ করেছিলেন। আল জোবায়ের (মৃত্যু: ২৫৬ হি.) বলেন,

'মালেকের এক কন্যা ছিল, যে তাঁর (মালেক রহ.-এর সংকলিত হাদিস গ্রন্থ) মুয়াত্তা সম্পূর্ণটি মুখস্থ করেছিল। মুয়াত্তার পাঠকগণ মুয়াত্তা পড়ার সময় কোনো ভুল করলে তাঁর কন্যা পর্দার আড়াল থেকে তা সংশোধন করে দিত।'

মুহাম্মাদ নামে তাঁর এক পুত্র ছিল। সে কোনো পড়ালেখা করেনি এ পেশাও অবলম্বন করেনি। প্রায়ই সে তাঁর কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে লুকোচুরি খেলত। ইমাম মালেক তাঁর ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন-

'ভালো আচরণ আল্লাহর হাতে। সে-ই আমার মেয়ে, সে-ই আমার ছেলে।

মদিনার বিখ্যাত যে নারীরা মালেক (রহ.)-এর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের একজন আবিদা আল মাদানিয়া। তিনি অসংখ্য হাদিস মুখস্থ করেছিলেন বলে খ্যাতি ছিল। ইবনুল আব্বার বলেন-'তিনি অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেন।

এই অস্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি যখন আমাদের নিকট অতিরঞ্জিত মনে হচ্ছে, তখন আরেকটা সত্য জেনে নেওয়া উচিত; তাঁরা ছিলেন নিখুঁত। এটি মূলত ইচ্ছাশক্তি ও চর্চার বিষয়। কেবল দামেশকেই ৩৫ জন নারীর সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা সমগ্র সহিহ বুখারি (সনদের ধারাবাহিকতাসহ) মুখস্থ করেছিলেন। তাঁরা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাইখ নুরুদ্দিন এতরের ছাত্রী ছিলেন।

২. লেখনী : রাসূল (সা.) (ইসলামের) শুরুর দিকে তাঁর মুখনিসৃত বাণী লিখে রাখতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, লোকজন পরে কুরআনের আয়াত ও হাদিস গুলিয়ে ফেরতে পারে। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি হাদিস লিখে রাখার মাধ্যমে সংরক্ষণের অনুমতি দিয়েছিলেন। রাসূল (সা.) নিজেই বলেছেন-যা উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-সহ অনেক সাহাবি কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে-

'লিখে রাখার মাধ্যমে জ্ঞান সংরক্ষণ নিশ্চিত করো।

আরবে ইসলামপূর্ব যুগে লেখার প্রচলন ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের সূচনালগ্ন থেকে লেখার গুরুত্ব দেখা যায়। সাহাবিগণ প্রথম লেখার দক্ষতা অর্জন করেন।

এরপর লেখালিখি শুরু করেন কুরআনের আয়াত ও হাদিসের বাণী লিপিবদ্ধ করার মাধ্যমে। নারীরাও এই প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করেন। স্বয়ং নবিজি তাঁর স্ত্রী হাফসা (রা.)-কে লেখা শেখানোর জন্য শিফা বিনতে আবদুল্লাহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইবনে আবদুল বার (মৃত্যু: ৪৬৩ হি.) বলেন-

*শিফা ছিল গুণবতী ও বুদ্ধিমতী নারীদের একজন। রাসূল (সা.) তাঁকে দেখতে যেতেন।

একইভাবে আয়িশা ও উম্মে সালামা (রা.)-সহ আরও অনেক নারী সাহাবি লেখালিখিতে ছিলেন দক্ষ। আয়িশা ও উম্মে সালামা (রা.)-এর চিঠিপত্রেরও সন্ধান পাওয়া যায়। আল কালকাশান্দি (মৃত্যু: ৮২১ হি.) একদল লিখতে জানা নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও তাঁদের নির্দিষ্ট কোনো কাজের কথা উল্লেখ নেই।

নারীদের মধ্যে লেখনী শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটেছিল হিজরি দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে। আমার লেখা জীবনী অভিধানটিতে নারীদের শিশুকাল থেকেই লেখালিখি ও ক্যালিগ্রাফি বিষয়ে শিক্ষাদানের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি নারী দাসরাও এসব বিষয়ে

দক্ষতা অর্জন করত বলে জানা যায়। জামা, পতাকা, ব্যানার, আলখেল্লা, জামার হাতা, পাগড়ি, বাঁধন, মাথার বেল্ট, বালিশ, রুমাল, মশারি, চাদর, বিছানা, সোফা, সোফার গদি, মুকুট, জানালার ফ্রেম, দরজার ফ্রেমসহ আরও অনেক কিছুতেই তাঁরা ক্যালিগ্রাফি ব্যবহার করত।
পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে যারা সব হাদিস মুখস্থ করতে পারত না, তাঁরা হাদিসের সংকলনগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে লিখিত হাদিস সংকলন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। যুগের এই চাহিদা মেটাতে অনেক নারী নিজ হাতে হাদিস সংকলন করেছেন। এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। এখানে কিছু মুহাদ্দিসাতের উদাহরণ উল্লেখ করছি, যারা ক্যালিগ্রাফিতে সুপরিচিত ছিলেন।
ফাতিমা বিনতে আল হাসান ইবনে আলি আল মুয়াদ্দিব আল আত্তার (মৃত্যু: ৪৮০ হি.), তাঁর বংশীয় উপাধি উম্মুল ফজল এবং বিনতে আকরা। তিনি অনুসরণ করেছিলেন বিখ্যাত ক্যালিগ্রাফার ইবনুল বাওয়াবকে (মৃত্যু : ৪১৩ পরবর্তী সময়ে তিনি এগুলো আরও অনেকের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েহিহি.)। মানুষজন তাঁর লেখনীকে (ক্যালিগ্রাফিক) উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করত।
ইবনুল জাওজি (রহ.) বলেন-'তাঁর লেখনী (ক্যালিগ্রাফি) ছিল অসাধারণ সুন্দর; তিনি ইবনে বাওয়াবের আদলে লিখতেন। তাঁর নিকট অনেকেই লেখালিখি শিখতেন। তাঁকে (বাইজাইন্টাইনের) শান্তিচুক্তি লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। লেখালিখির জন্য তিনি আমিদ আল মুলক আবু নাসর আল কিন্দির (মৃত্যু: ৪৫৬ হি.) নিকট গিয়েছিলেন।
ইবনে কাসির বলেন-'তিনি ইবনে বাওয়াবের আদলে “মানসুব” ক্যালিগ্রাফি লেখেন।
আস-সাময়ানি বলেন-'আমি মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল বাকি আল আনসারিকে বলতে শুনেছি, আমি ফাতিমা বিনতে আকরাকে বলতে শুনেছি-আমি আমিদ আল মুলকের জন্য একটা লেখা লিখেছিলাম। তিনি সেটার বিনিময়ে আমাকে এক হাজার দিনার দিয়েছিলেন।
স্পষ্টত তিনি ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, যার শিল্প অতি উঁচু মাত্রায় মূল্যায়িত ও বিবেচিত হতো। এই কাজের জন্য তিনি বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণও করতেন।
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু নসর আহমাদ বিন আল ফারাজ আল দিনাওয়ারির (মৃত্যু: ৫৭৪ হি.) কন্যা 'ফখরুন-নিসা' উম্মে মুহাম্মাদ শুহদার বিষয়ে আস- সাময়ানি বলেন-'তিনি ছিলেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী, স্বাতন্ত্র্য, উন্নত রুচি ও সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী। তিনি বিনতে আল আকরার আদলে লেখালিখি করতেন। তাঁর সময়ে বাগদাদে তাঁর হাতের লেখার মতো আর কারও হাতের লেখা ছিল না। তিনি সাধারণত খলিফা আল মুকতাফির (শাসনকাল : ৫৩০-৫৫ হি.) জন্য লিখতেন। '
দীর্ঘ জীবনে তাঁর ক্যালিগ্রাফি, ভালো স্বভাব ও বদান্যতার প্রশংসা করেন ইবনুল জাওজি।
আস-সাফাদি (মৃত্যু : ৭৬৪ হি.) তাঁকে হাদিস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী, ধার্মিকতা, আল্লাহভীতি, দয়া ইত্যাদির জন্য বিশেষভাবে স্মরণ করেন এবং তাঁকে 'দ্যা ক্যালিগ্রাফার' 'নারী জাতির অহংকার' ইত্যাদি নামে ভূষিত করেন। তিনি ছিলেন ইরাকের একজন উঁচু মানের

ইসনাদবিশিষ্ট মুহাদ্দিসা।১১৮ তাঁর লেখনী (মানসুব) অনেক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে ছিল।’

আরেক উদাহরণ হলেন, আল আফিফ ইবনে মানসুরের বংশধারার ফাউজ বিনতে মুহাম্মাদ ইবনে হাসান ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে আলি। উজির আল হাদি ইবনে ইবরাহিম বলেন-'তিনি ছিলেন একজন আলিমা। তাঁর ছিল অভিনব হাতের লেখনী।'

কুরআনের শুরুতে কিংবা অন্য গ্রন্থাদির শুরুতে অঙ্কিত ক্যালিগ্রাফির জন্য তিনি বিশেষভাবে খ্যাত। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে পুরুষদেরও আরবি শেখাতেন। ইয়েমেনের রাজধানী সানায় 'আল মাশহাদ আল আহমারে', ইবনে ওয়াহাবের মসজিদের পাশে তাঁর কবর।

হাদিস সংগ্রহের পদ্ধতি

হাদিসবিশারদগণ হাদিস সংগ্রহের আটটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সেই আটটি পদ্ধতির উত্তম ব্যবহার করেছেন। অন্যের নিকট হাদিস বর্ণনার সময় সুনির্দিষ্ট সূত্র উল্লেখ করতে হয়। এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই নিম্নোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়।

১. সামাআ (শোনা): হাদিসের শিক্ষকগণের মধ্যে এই ঐতিহ্য ব্যাপকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তাঁরা হাদিস শোনার সময় বর্ণনাকারীর (রাবি) ধারাবাহিকতা সম্পর্কে এবং এই ধারা রাসূল (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে নিতেন। একই সঙ্গে তাঁরা এই ধারা বা সনদ সংরক্ষণ করতেন।

২.আরজ (নিবেদন): আরজ বা নিবেদন বলতে শিক্ষকের সামনে হাদিস পড়ে শোনানোকে বুঝায়। ইবনে সালাহ বলেন 'আপনি কারও সামনে পাঠ করে অথবা কেও আপনার সামনে পড়ে শোনাচ্ছেন, আর আপনি কোন বই থেকে তা যাচাই করছেন অথবা আপনার মুখস্থ থাকায় স্মৃতি থেকে যাচাই করছেন অথবা কোন শাইখের সামনে পাঠ করা হচ্ছে, তিনি শুনছেন কিংবা তার বিশ্বস্ত কেও শুনছেন- এ সবই একই রকম।

৩.ইজাজা: কোন শিক্ষকের বর্ণনা বা লেখনী থেকে বর্ণনা করার জন্য শিক্ষকের পক্ষ থেকে কাউকে আনুষ্ঠানিক অনুমতি প্রদানই হলো ইজাজা

৪.আল মুনাওয়ালা (উপস্থাপন): শিক্ষক যখন তার মূল গ্রন্থ কিংবা মূল গ্রন্থে যা আছে তা ছাত্রের নিকট উপস্থাপন করেন অথবা ছাত্র তার মূল উপাদান শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করেন এবং 'এটি আমার হাদিস অথবা হাদিসের গ্রন্থ, এখান থেকে বর্ণনা করুন' -এমন নির্দেশনা দেন, তখন এটাকেই মুনাওয়ালা বলা হয়।

৬.আল মুকাতাবা: মুকাতাবা অর্থ চিঠিপত্রের আদান-প্রদান, যেখানে শিক্ষক লুখিত পত্রাকারে ছাত্রের নিকট হাদিসের একটি লিখিত গ্রন্থ সরবরাহ করেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে হাদিস বর্ণনার অনুমতি দেন। এটা অনেকটা ইজাজার মতো।

৬. আল ইলাম : শিক্ষক যখন তাঁর ছাত্রকে অমুক অমুকের বরাত দিয়ে কোনো হাদিস অথবা হাদিসের গ্রন্থ সম্পর্কে জানান, কিন্তু তা থেকে হাদিস বর্ণনার অনুমতির প্রসঙ্গটি উহ্য রাখেন, তখন সেটিকে ইলাম বলে।২১৮ এই বিষয়ে চিন্তাবিদগণের মতপার্থক্য উল্লেখ করে ইবনে সালাহ বলেন- 'গ্রহণযোগ্য মত হলো, বহু বর্ণনাকারীর বরাতে বর্ণিত হাদিস গ্রহণযোগ্য নয়।

৭. আল ওয়াসিয়া : ওয়াসিয়া হলো কোনো শাইখ মৃত্যুর সময় তাঁর হাদিস কিংবা অন্য কোনো লেখনী কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে যাওয়া। কিছু কিছু আলিম এমন হাদিসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম মনে করেন, সুস্পষ্ট অনুমতির (যেমন : ইজাজা) অনুপস্থিতির কারণে এমন হাদিস বর্ণনাযোগ্য নয়।

৮. আল বিজাদা : বিজাদা (শাব্দিক অর্থ-পাওয়া) হলো, একজন ব্যক্তি কোনো হাদিস কিংবা হাদিসের গ্রন্থ থেকে হাতের লেখা দেখে হাদিস রচয়িতার নাম বের করা এবং বলা-'আমি অমুক অমুকের হাতের লেখা থেকে জানতে পেরেছি...'

হাদিস রেওয়ায়েতে নারী

এখনো আমাদের উপমহাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে বুখারি শরিফ পড়ানো হয় এবং ভবিষ্যতেও পড়ানো হবে, ইনশা আল্লাহ।বুখারি শরিফ কার রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে ওটা অনেক মানুষের ই অজানা। এটি বিখ্যাত মুহাদ্দিসা কারিমা রহিমাহাল্লার রেওয়ায়েতে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর হাজার হাজার ছাত্রের মধ্যে মুহাদ্দিসা কারিমার কাছে হাদিস শিক্ষাকারী যত ছাত্র এবং তাদের থেকে যাঁরা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা অকল্পনীয়। আল্লাহ তাআলা এই মুহাদ্দিসার রেওয়ায়াতকে যেভাবে কবুল করেছেন, ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর অন্য কোনো ছাত্রের রেওয়ায়াতকে এতটা মাকবুল বানাননি। ইমাম বুখারির অন্য কোনো ছাত্রের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য নসিব হয়নি।

শায়খুল হিন্দ হজরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহিমাহুল্লাহ, যিনি নিজে বুখারি শরিফ পড়েছেন এবং বুখারি শরিফ পড়াতেন, মাওলানা খলিল আহমাদ সাহারানপুরী নিজে বুখারি শরিফ পড়েছেন এবং বুখারি শরিফ পড়াতেন, শাইখ হুসাইন বিন মুহসিন আনসারী, যিনি ভুপালে দরসে হাদিসের খিদমত করতেন, শাইখুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া সাহেব- মহান আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করুন- তাঁরাও নিজে বুখারি শরিফ পড়েছেন এবং বুখারি শরিফ পড়াতেন, তাঁরা সবাই বিখ্যাত মুহাদ্দিসার কারিমা রহিমাহাল্লার রেওয়ায়াতেই পড়াতেন। সুবহানা আল্লাহ! কত বড় একটি সৌভাগ্যের বিষয়। পৃথিবীর কোন জাতি ইলমি অঙ্গনে তাদের নারীর অবদানের এ রকম উজ্জ্বল উপমা উপস্থাপন করতে পারবে না। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর ছাত্ররা বুখারি শরিফকে পুরো বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং মহান আল্লাহ তাআলাও তাঁর ছাত্রদের সেই প্রচেষ্টার প্রতিদান দিয়েছিলেন; সে জন্যই তো আজ পুরো পৃথিবীব্যাপী তাঁর নামের গৌরব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ইমাম বুখারি রহিমাহুল্লাহর ছাত্রদের মতো তাঁর মুহাদ্দিসা ছাত্রীদের মাধ্যমেও আল্লাহ তাআলা এই খেদমত উম্মতে মুসলিমাহর মধ্যে বাকি রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাদেরও কবুল করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের ইসলামি সমাজে এই খেদমত দীর্ঘদিন স্থায়ীভাবে টিকে থাকবে, ইনশা আল্লাহ।

হাদিস চর্চায় বিভিন্ন মুহাদ্দিসা নারী

হাদিস বর্ণনায় নারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ছিলেন হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা। তার বর্নিত হাদিসের সংখ্যা ২৪০৫ টি। হজরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার রেওয়ায়েতকৃত হাদিস সমূহ সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে স্থান পেয়েছে।

হাদিস চর্চায় কি অল্প সংখ্যক নারীর নাম নিম্নরুপ:

১.শুহূদাহ বিনতে আবু নাসর খাদিজা বিনতে (মৃত্যু: ৫৭৪ হিজরি)

২.খাদিজা বিনতে আল কাজি আল আনজাব আবুল মোকারিম আল মুফাদ্দাল ইবনে আলি আল মাকদিসি (মৃত্যু : ৬১৮ হিজরি)

৩.উম্মুল ফাদল কারিমা বিনতে আবু মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহাব আল কুরাশিয়া আল জুবায়রিয়া(মৃত্যু : ৬৪৩ হিজরি)

৪.দওউস সাবাহ আজিবা বিনতে আবু বকর আল বাকদারিয়া (মৃত্যু :৬৪৩ হিজরি)

৫.সাইয়্যিদা বিনতে মুসা ইবনে উসমান ইবনে দিরবাস আল মারানিয়া (মৃত্যু :৬৯৫ হিজরি)

৬.ওয়াজিহা বিনতে আলি ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে সুলতান আল আনসারিয়া আস-সাইয়্যিয়া আল ইসকান্দারানিয়া

৭.জয়নব বিনতে আল কামাল আহমাদ ইবনে আব্দুর রহিম ইবনে আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে আহমাদ আল মাকদিসি (মৃত্যু :৭৪০ হিজরি)

৮.ফাতিমা বিনতে ইবরাহিম আব্দুল্লাহ ইবনে আশ-শাইখ আবু উমর আল মাকদিসিয়া (মৃত্যু :৭৪৭ হিজরি)

৯).মরিয়ম বিনতে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহিম আল আজরাইয়া (মৃত্যু : ৮০৫ হিজরি)

১০.উম্মুল হাসান ফাতিমা বিনতে খলিল ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল কিনানি (মৃত্যু : ৮৩৮ হিজরি)

সাহিত্য চর্চায় নারীর ভূমিকা

আরবি সাহিত্যশাস্ত্রে নারীদের অবদান এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি

আমাদের ইতিহাসে আরবি সাহিত্যশাস্ত্রে নারীদের অবদান এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি ছিল। বিলাদাহ বিনতে মুসতাকফি নামে স্পেনের একজন আমিরের মেয়ে ছিলেন। তাঁর সাহিত্য ও কাব্যিক দরবার এমনভাবে অনুষ্ঠিত হতো, মনে হতো সেটা কোনো রাজা-বাদশাহর দরবার । বড় বড় লেখকেরা নিজ ইলমি উন্নতি-উপকারের জন্য তাঁর কাছে আসতেন । আমি আর কতজনেরই- বা উদাহরণ দিতে পারি! আমি ইতিহাসে দুর্বল! আমি বিস্তারিত উদাহরণে যেতে চাই না। আমি তো পবিত্র কোরআনুল কারিমের মহান অলৌকিকত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে চাই এবং আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন:

لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ. ٍ

আমি তোমাদের মধ্যে কোনো আমলকারীর প্রতিদান নষ্ট করব না; চাই সে পুরুষ হোক বা নারী। তোমরা একে অপরের অংশ। (সুরা আলে ইমরান : আয়াত ১৯৫)

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের নারীদের বলতে চান, আমি তোমাদের নারী-পুরুষ কারো আমলই নষ্ট করব না। সত্যিকার অর্থেই যদি তোমর ইবাদতে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করো, তাহলে আমি তোমাদের রাবিয়া বসরি কেন, তার চেয়েও ঊর্ধ্বের মাকাম দান করব!

আমাদের ইলমি অঙ্গনে নারীদের অবদান

দ্বীনি বিধিবিধান পালন করে, ইসলামের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে ও সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে ইসলামের ইতিহাসে ও মুসলিম বিশ্বে সমকালীন নারীরা আধ্যাত্মিকতার এমন সুউচ্চ স্তরে পৌঁছেছেন, যেখানে হাজার হাজার নয়, বরং সে যুগের লক্ষ লক্ষ মানুষও পৌঁছাতে পারেনি। তেমনি একজন ছিলেন রাবেয়া বসরি। রাবেয়া বসরি ছিলেন ওমন একজন নারী যে, তাঁর যুগের হাজার হাজার কেন; লক্ষ লক্ষ মানুষ এমন পাওয়া যাবে, যাঁরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভের ক্ষেত্রে তাঁর স্তরে উপনীত হতে পারেননি।

ইসলামি বিশ্বের অন্যান্য ইতিহাস পড়ে জানা যায় মুসলিম সাহিত্যিকা ও বিদ্বান নারীদের ইতিহাস আলাদা আলাদাভাবে লেখা হয়েছে। আমিরা যদি ইসলামের ইতিহাস পড়ি তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের বোনেরা সেই প্রাচীন যুগেও একাডেমিক অবস্থানে এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন যে সে সময়ের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বিষয় জানার জন্য তাঁদের কাছে যেতেন। তৎকালীন আন্দালুস, বাগদাদ, কায়রো এবং হারামাইন শরিফে এমন অসংখ্য মহিলা ছিলেন, যাঁদের কাছে লোকেরা প্রশ্ন করার জন্য এবং আরবি অভিধান বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সফর করত। তাঁদের কাছে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য যেত। ইতিহাস সাক্ষী আছে, তাঁদের ছাত্রদের মধ্যেও বড় বড় ব্যক্তিত্ব জন্মলাভ করেছেন এবং পুরো পৃথিবীকে আলোকিত করেছেন। তাই জ্ঞানের এই সম্পদ পুরুষদের একচেটিয়া নয়। নারী-পুরুষ উভয়ই তাতে সমান অংশীদার।

আধ্যাত্মিকতায় নারী

ইসলামের সকল ক্ষেত্রে পুরুষ এর সাথে সাথে নারীদেরও অবদান আছে। তেমনি আধ্যাত্মিকতায়ও নারীর অবদান আছে।

কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয় এর চেয়ে আধ্যাত্মিকতার বিষয়টা একটু ভিন্ন।

পৃথিবীর শুরু থেকেই আল্লাহ তাআলা মানব জাতির হেদায়েত এর জন্য অসংখ্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। তাদের সবাই পুরুষ , একজনও নারী নেই।

কিন্তু নবী না পাঠালেও অনেক মহিলা কে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে সম্মানিত করে পাঠিয়েছেন। যেমন হজরত মারইয়ার (আ), হজরত আছিয়া ইত্যাদি। পরবর্তীতে ইসলামের শুরু থেকেই নারীরা অকআিলা অবদান শেখ চলেছেন।

• আধ্যাত্মিকতায় নারীদের সূচনা:

পুরুষগণের আধ্যাত্মিকতায় সূত্রপাতের সূচনা আসহাবে সুফফাদের আদর্শ অনুকরনের মাধ্যমে হয়েছে বলে মনে করা হয়। একই রকমভাবে নারীদের আধ্যাত্মিকতার সূচনা নবী (সা) এর পরিবার তথা খাদিজা (রা), ফতিমা (রা), আয়েশা (রা) এর মাধ্যমে হয়েছে বলে ধরা যায়। মুয়াযা বিনতে আব্দুল্লাহ আল আদাভিয়্যা, ইবনে সিরিনের দুই বোনসহ বেশ কয়েকজন নারী সুফি সরাসরি সাহাবি ও তাবেয়ীদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

রাসুলুল্লাহ (সা) এর জীবন চরিত, তার বানী এবং সাহাবীগণের জীবন চরিতে যুহদ অবলম্বন করার পরিপূর্ন আদর্শ খুজে পেয়েছিলেন তারা। কিভাবে সবকিছু ছেড়ে এক আল্লাহর ধ্যানে, তার যিকরে মগ্ন হতে হয়, সে শিক্ষাও তারা কুরআন ও হাদিসে পেয়েছিলেন।

যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কোরআনে বলেন,

আন-নাহ্‌ল 16:97

مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّنۡ ذَکَرٍ اَوۡ اُنۡثٰی وَہُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡیِیَنَّہٗ حَیٰوۃً طَیِّبَۃً ۚ وَلَنَجۡزِیَنَّہُمۡ اَجۡرَہُمۡ بِاَحۡسَنِ مَا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ

"যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব"

কুরআনে এমন আরও অনেকগুলো আয়াতে পুরুষদের সাথে নারীদেরও সমানভাবে আল্লাহর অভিমুখী হতে বলা হয়েছে।

হাদিসেও আমরা একই ধরনের নির্দেশনা দেখতে পাই। হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মুফাররিদরা অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, মুফাররিদ কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি (সা) বললেন, বেশি বেশি আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ এবং নারী। -সহীহ মুসলিম, হাদীস **১৮৯১**

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি আধ্যাত্মিকতায় পুরুষদের সাথে নারীদেরও বিরাট অবদান আছে।

বিভিন্ন নারী সুফিদের নাম:

১. রাবিয়া আল আদাভিয়্যা

২. লুবাবা আল মুতাআব্বিদা

৩. মারইয়াম আল বাসরিয়্যা

৪. মুমিনা বিনত বাহলুল

৫. মুআযা বিনত আব্দুল্লাহ আল আদাভিয়্যা

৬. শাবাকা আল বাসরিয়্যা

৭. নুসাইয়া বিনত সালমান

৮. রাইহানা আল ওয়ালিহা

৯. গুফাইরা আল আবিদা

১০. আফিয়া আল মুশতাক্কাহ

১১. উম্ম আবদুল্লাহ বিনত খালিদ ইবন মা'দান

১২. উনাইসা বিনত আমর আল আদাভিয়্যা

১৩. উম্ম আল আসওয়াদ বিনত যায়দ আল আদাভিয়্যা

চতুর্থ অধ্যায়:

দ্বীন প্রতিষ্ঠায় নারীর ভূমিকা

জিহাদের ময়দানে নারীদের বীরত্ব

হজরত আসমা বিনতে আবি বকর রাদিআল্লাহু আনহার বীরত্ব ও সাহসিকতা

হজরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.)-এর ছেলে জুবাইর ইবনুল আওয়াম বড় ফকিহ, বড় আলেম, অত্যন্ত সাহসী এবং বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি খলিফা আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন। খলিফার রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়েছিল, তাই তিনি তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতির ওপর নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। ফলাফলে আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সাথে তাঁর কঠিন লড়াই হয়েছিল। যুদ্ধে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হয়ে যান। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ আবদুল্লাহ বিন জুবায়ের (রা.)-কে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেন এবং বলেন, যতক্ষণ না তাঁর মা সুপারিশ করবেন, আমি তাঁকে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নামাব না। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন সাহাবি। তাঁর আব্বা সাহাবি। তাঁর মা-ও সাহাবি। তিনি হজরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হজরত হজরত আসমা বিনতে আবি বকর 'জাতুন নিত্বকইন'- এর ছেলে।

উপস্থিত লোকজনের জন্য এই দৃশ্যটা দেখা অনেক কষ্টকর ছিল, তাঁরা সকলেই অঝোরে কাঁদছিলেন। পরিশেষে বাধ্য হয়ে সবাই তাঁর মায়ের কাছে এলেন এবং হাত জোড় করে বললেন, 'আল্লাহর দোহাই, আমাদের প্রতি রহম করুন। আপনার সাহসের কোনো তুলনা নেই। শুধু একটি বাক্য বলুন, যা আমাদের এই ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখা থেকে বাঁচাবে।' আপনি কি জানেন, আল্লাহ তাআলার এই সাহসী বান্দি তখন কী উচ্চারণ করেছিলেন? তিনি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'এই শক্তিশালী ঘোড়সওয়ারির কি এখনো পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময় আসেনি?' তিনি বীর বাহাদুর এবং সাহসীর মতো উচ্চারণ করেছিলেন, 'এখনো কি তার ঘোড়া থেকে নামার সময় হয়নি?'

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এটারই অপেক্ষায় ছিল। সে তার এই কথাটাকেই বাহানা বানিয়ে নিল এবং হজরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা.)-কে ফাঁসির কাষ্ঠ থেকে নামানোর হুকুম দিল।

হজরত খানসা রাদিয়াল্লাহু আনহার ধৈর্য ও অবিচলতা

আপনাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরা নিশ্চয়ই হজরত খানসা (রা.)-এর নাম শুনেছেন। তিনি আরবি ভাষার চিরন্তন ও অমর কবিদের একজন। তাঁর দুই ভাই মারা গেলে তিনি তাঁদের শোকে এমন শোকগাথা আবৃত্তি করেন, শুধু আরবি ভাষা কেন, পুরো বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমি আরবি সাহিত্যের ছাত্র। আমি তাঁর কবিতা পড়েছি। এই ঘটনা তখনকার, যখন হজরত খানসা ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হননি। দেখুন, ইসলাম মানুষের হৃদয়-মনে কী বিপ্লব এনেছিল! যে আল্লাহর বান্দি তাঁর ভাইদের জন্য কেঁদে কেঁদে শোকগাথা আবৃতি করতেন; যা শুনে লোকেরা অঝোরে কাঁদত, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিরহ এবং শোকগাথার মধ্যেই নিবদ্ধ থাকত, ইসলাম গ্রহণের পর এই আল্লাহ তাআলার বান্দির মধ্যেই এক বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, যা আগে কখনো কল্পনাও করা যায়নি। আপনারা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন, ভাই আর ছেলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। ছেলে তো কলিজার টুকরো, নিজের শরীরের অংশ। ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা যত বেশিই হোক না কেন, কখনোই সেটা ছেলের ভালোবাসার চেয়ে বেশি হতে পারে না।

একবার এক যুদ্ধের সময় তিনি তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন, 'বাবারা, যুদ্ধের ময়দানে কখনো তোমরা তোমাদের পিঠ দেখাবে না। আমি যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত হওয়ার জন্য তোমাদের দুধ পান করাইনি!' আলহামদুলিল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য, তিনি এসব মহান মানুষের সাক্ষী দ্বারা আমাদের সম্মানিত করেছেন!

হজরত সফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার সাহসিকতাপূর্ণ আচরণ

বনু কুরাইজের সাথে যুদ্ধে মুসলিম নারীরা যে দুর্গে অবস্থান করছিলেন, সেটা বনু কুরাইজার লোকদের কাছাকাছি ছিল। ইহুদিরা যখন দেখল মুসলমানরা সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আছেন, তখন হঠাৎ করেই তারা দুর্গের ওপর আক্রমণ করল। এক ইহুদি দুর্গের গেটের কাছে পৌঁছে গেল এবং দুর্গ আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে লাগল। হজরত সাফিয়া (রা.), রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু, সেই ইহুদিকে দেখে ফেললেন।

হজরত হাসসান বিন সাবিত (রা.)-কে মুসলিম নারীদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। হজরত সাফিয়া (রা.) তাকে ডেকে বললেন, আপনি নিচে নেমে এই ইহুদিকে হত্যা করুন। অন্যথায় সে পালিয়ে যাবে এবং শত্রুদের সংবাদ দেবে। হজরত হাসসান বিন সাবেত (রা.)-এর একটি কঠিন রোগ ছিল; যার কারণে তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি যুদ্ধের কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই তিনি নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন, আমি যদি সত্যিই যুদ্ধ করার উপযুক্ত হতাম, তাহলে এখানে কেন অবস্থান করছি? হজরত হাসসান বিন সাবেত (রা.)-এর কথা শুনে হজরত সাফিয়া (রা.) তাঁবুর একটি খুঁটি উপড়ে ফেললেন এবং নিচে নেমে ইহুদির মাথায় এমন জোরে আঘাত করলেন যে তার মাথা ফেটে গেল। এরপর তিনি হজরত হাসসান বিন সাবেত (রা.)-কে বললেন, তার অস্ত্র এবং কাপড় নিয়ে এসো। হজরত হাসসান (রা.) বললেন, এবারের মতো তাকে যেতে দিন। আমাদের তাকে আর কোনো প্রয়োজন নেই। হজরত সাফিয়া (রা.) বললেন, যাও, এই পাপিষ্ঠ ইহুদির মাথা কেটে দুর্গের নিচে ফেলে দাও; যাতে ইহুদিরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয় কিন্তু পরিশেষে এই খেদমতটিও হজরত সাফিয়া (রা.)-কেই করতে হয়েছিল। ইহুদিরা তাদের সৈন্যের কাটা মাথা দেখে নিশ্চিতভাবে এটা বিশ্বাস করে নিল যে দুর্গেও সৈন্যবাহিনী আছে। এই বিশ্বাসের কারণে দুর্গের ওপর তাদের আর হামলার সাহস হলো না।

মা নিজেই যখন নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন

উম্মুল মুমিনিনের হজরত আয়েশা (রা.) বনি হারেসার যে দুর্গে মুসলিম মহিলাদের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলেন- তখনো পর্দার আদেশ নাজিল হয়নি- সেখানে হজরত সাদ বিন মুআজ (রা.)-এর মা-ও তাঁর সাথে ছিলেন। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, আমি দুর্গের বাইরে হাঁটতে হাঁটতে পেছন থেকে কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমি পেছনে ফিরে তাকাতেই দেখলাম হজরত সাদ (রা.) হাতে বর্শা নিয়ে যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলছেন এবং বীরদর্পে এই কবিতা আবৃত্তি করছেন:

لَبِّثْ قَلِيلاً يُدْرِكِ الْهَيْجَاءَ جَمَلْ لَا بَأْسَ بِالْمَوْتِ إِذَا الْمَوْتُ نَزَلْ উট খুবই শান্ত-কোমল, উত্তেজিত হলে, ভয় পায় না মৃত্যু-আঘাত যুদ্ধ শুরু হলে!

হজরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা তাঁর কবিতা শুনে চিৎকার করে বললেন, বাবা, তুমি দ্রুত যাও। তুমি তো অনেক দেরি করে ফেলেছ! হজরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্শা এত ছোট ছিল যে তাঁর দুই হাতই বর্শার বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। তিনি ঠিকমতো বর্শাটিও সামাল দিতে পারছিলেন না। সেই যুদ্ধে হজরত সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দেখে ইবনুল আরাকা নিশানা তাক করে একটি তীর নিক্ষেপ করলে হজরত সাদ (রা.)-এর হাতের একটি রগ কেটে যায়। খন্দকের যুদ্ধ চলাকালীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের আঙিনায় তাঁর জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করেন এবং সেখানে তাঁর সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন নিতে শুরু করেন। এই যুদ্ধে মহিলা সাহাবিদের মধ্যে হজরত জুবায়দাহ রাদিয়াল্লাহ আনহাও ছিলেন। যিনি সব সময় নিজের কাছে ওষুধ রাখতেন এবং আহতদের ব্যান্ডেজ করতেন। মসজিদে নববির এই তাঁবুটি তাঁরই ছিল এবং তিনিই তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু তখন তাতে কোনো লাভ হয়নি। অনেক দিন পর, অর্থাৎ বনু কুরাইজার সাথে যুদ্ধের পর তাঁর ক্ষতটি খুলে দেওয়া হয় কিন্তু তিনি আর সুস্থ হননি, বরং সে আঘাতের কারণেই তিনি মারা যান।

মুসলিম নারীদের সেবা-যত্ন এবং আত্মোৎসর্গের অকল্পনীয় উপমা

উহুদ যুদ্ধে অধিকাংশ মুসলমান নারীও অংশগ্রহণ করেন। হজরত আয়েশা (রা.) ও হজরত উম্মে সুলাইম (রা.) (যিনি হজরত আনাস (রা.)-এর মা) আহতদের সেবা করতেন। তাঁরা মশক ভর্তি করে আহতদের পানি পান করাতেন।

বুখারি শরিফের একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হজরত আয়েশা (রা.) এবং উম্মে সুলাইম (রা.)-কে দেখেছিলাম, তাঁরা নিজেদের ওড়না শক্ত করে বেঁধে তাতে ভর্তি করে পানি আনছিলেন এবং আহতদের পানি খাওয়াচ্ছিলেন। মশক খালি হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা খালি পাত্রে পানি আনতে যেতেন এবং পানি ভরে পুনরায় আহতদের পানি পান করাতেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, হজরত আবু সাইদ খুদরি (রা.)-এর মা উম্মে সালিত (রা.)ও সেদিন একই খেদমত করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি ওই সময় খেদমত করেছিলেন, যখন কাফেররা তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেখানে মাত্র কয়েকজন সাহাবি ছিলেন।

এক আনসারি সাহাবি আফিফা রাদিয়াল্লাহু আনহার বাবা, ভাই ও স্বামী সবাই এই যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। পালাক্রমে এই তিনটি বড় দুর্ঘটনার আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে এসেছিল কিন্তু (আল্লাহু আকবার! তাঁদের ইমানের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করুন) প্রতিবার তিনি শুধু এটাই জিজ্ঞেস করতেন, নবীজি

কেমন আছেন? সাহাবায়ে কেরাম যখন বললেন, রাসুলুল্লাহ নিরাপদে আছেন এবং তিনিও যখন কাছাকাছি এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় চেহারা দেখলেন, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেল, হে আল্লাহর রাসুল! আপনাকে দেখার পর সব বিপদ আমার জন্য তুচ্ছ!

میں بھی اور آپ بھی شوہر بھی برادر بھی فدا اے شاہ دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

আমি, আমার ভাই-স্বামী সব আপনার তরে ফিদা! আপনি থাকলে তুচ্ছ সবি, করব সবি ফিদা!

সে যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে সত্তরজন সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন; যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন আনসার, কিন্তু তখন মুসলমানদের দারিদ্র্য এমন কঠিন আকার ধারণ করেছিল যে শহীদদের কাফন দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ কাপড় তাঁদের কাছে ছিল না। দুজন দুজন করে সব শহীদ সাহাবিকে রক্তাক্ত অবস্থায় একই সাথে একটি কবরে দাফন করা হয়। শহীদ দুজনের মধ্যে যাঁর কোরআনুল কারিম বেশি মুখস্থ ছিল, তাঁকে আগে রাখা হয়। এমনকি সে সময় এই শহীদদের জানাজার নামাজও পড়া হয়নি। তাঁদের মৃত্যুর আট বছর পর, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর দুবছর আগে, যখন তিনি সেসব সাহাবির কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশেষ এক

অবস্থা দেখা গেল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁদের স্মরণে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে এমন বেদনাপূর্ণ কথা উচ্চারণ করলেন, মনে হচ্ছিল যেন একজন জীবিত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিদের বিদায় জানিয়ে তাঁদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন! তারপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে একটি খুতবায় বললেন, হে মুসলমানরা! আমি ভয় পাই না যে তোমরা আবার মুশরিক হয়ে যাবে; বরং আমি ভয় পাচ্ছি, আমার পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পর তোমরা আবার দুনিয়ার মোহ-মায়া এবং লোভ-লালসার জালে আটকা পড়ে যাবে।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নারী

খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য চরিত্র। তিনি শুধু নবীজী (সা)-এর স্ত্রীই ছিলেন না, বরং ইসলামের প্রথম সমর্থক, সর্বপ্রথম নারী মুসলিম এবং নবীজীর (সা) দাওয়াতের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

খাদিজা (রা) ছিলেন অত্যন্ত সৎ, পবিত্র এবং সম্মানিত চরিত্রের অধিকারী

ইসলাম গ্রহণের প্রথম ঘটনা

নবুয়্যতের দুই তিন বছর আগে থেকেই রাসুলুল্লাহ (সা) রমাদান মাসে হেরা গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন।রাসুলুল্লাহ (সা) এর ৪০ তম বছরে নবুয়্যত প্রাপ্ত হন। সেইবছর রমাদান মাসে মহানবী (সা) হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় প্রথম ওহি লাভ করেন। ফেরেশতা জিবরাইল (আ) নবুয়্যতের বার্তা নিয়ে আসেন এবং তাকে সুরা আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত শোনান।

ওহি পাওয়ার পর নবীজী (সা.) কিছুটা উদ্বিগ্ন এবং ভীত অবস্থায় খাদিজা (রা)-এর কাছে ফিরে আসেন।নবীজী (সা) আসার পর তাকে চাদর দিয়ে আবৃত করে দিতে বলেন। রাসুলুল্লাহ (সা) এর এই অবস্থা দেখে খাদিজা (রা) তাকে কি হয়েছে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা) বিস্তারিত জানালেন। তখন খাদিজা (রা) তাকে সান্ত্বনা দেন এবং বলেন,

"আল্লাহ কখনোই আপনাকে অসম্মান করবেন না। আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন, মেহমানদারি করেন, অসহায়দের সাহায্য করেন এবং সত্যের পথে দৃঢ় থাকেন।" অতপর রাসুলুল্লাহ (সা) খাদিজা (রা) কে ঈমানের দাওয়াত দিলে খাদিজা (রা) নবীজী (সা.)-এর নবুয়তকে বিনা দ্বিধায় মেনে নেন এবং ইসলামের প্রথম মুসলিম হিসেবে ঈমান গ্রহণ করেন। এবং প্রথম মুসলিম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

খাদিজা (রা)-এর ইসলাম ও নবীজীর (সা.) প্রতি অবদান

1.আর্থিক সাহায্য:

•খাদিজা (রাঃ) তার সম্পদ ইসলামের দাওয়াতের কাজে ব্যয় করেন।

•ইসলামের প্রথম যুগে নবীজী (সা.) ও সাহাবিদের ওপর কুরাইশদের নিষেধাজ্ঞার সময় তার সম্পদই মুসলিমদের বাঁচিয়ে রাখে।

2.নৈতিক সমর্থন:

•নবুয়তের প্রথম দিকের চ্যালেঞ্জগুলোতে খাদিজা (রা)-এর সান্ত্বনা ও সমর্থন নবীজী (সা.)-এর জন্য অপরিহার্য ছিল।

•তিনি নবীজীকে সবসময় আশ্বস্ত করতেন এবং তার ওপর অগাধ বিশ্বাস রাখতেন।

3.পরিবার:

•নবীজী (সা.)-এর ছয় সন্তানের মা ছিলেন খাদিজা (রা)।

•তাদের সন্তানদের মধ্যে কাসেম, আবদুল্লাহ, জয়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন।

খাদিজা (রা)-এর মৃত্যু

•খাদিজা (রাঃ) ৬২০ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় ইন্তেকাল করেন, যা হিজরতের তিন বছর আগে ঘটে।

•তার মৃত্যুর বছর নবীজী (সা.) "আমল হুযন" বা শোকের বছর হিসেবে ঘোষণা করেন।

•তিনি জান্নাতে স্থানপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন এবং তার জন্য আল্লাহ নিজে জান্নাতে একটি সুন্দর প্রাসাদের সুসংবাদ দিয়েছেন।

ইসলামে খাদিজা (রা)-এর মর্যাদা

খাদিজা (রা) ছিলেন এমন একজন নারী যাকে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সালাম জানিয়েছেন।

•তিনি ছিলেন একমাত্র নারী, যাকে নবীজী (সা.) তার জীবদ্দশায় আরেকটি বিয়ের প্রয়োজন অনুভব করেননি।

•নবীজী (সা.) সবসময় খাদিজা (রা)-এর কথা গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন।

প্রথম শহীদ একজন নারী

সুমাইয়া বিনতে খায়াত (রাঃ) ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নাম, যিনি প্রথম নারী শহীদ হিসেবে অমর হয়ে আছেন। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং তার পরিবারসহ ইসলামের জন্য মহান ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

পরিচয়:

সুমাইয়া (রাঃ) একজন আফ্রিকান বংশোদ্ভূত নারী ছিলেন এবং মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আবু হুদাইফা ইবনে মুগীরার অধীনস্থ একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। তিনি ইয়াসির ইবনে আমির-এর স্ত্রী ছিলেন। তাদের সন্তান আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ)-ও ইসলামের একজন বিশিষ্ট সাহাবি ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ:

ইসলামের শুরুতেই সুমাইয়া (রাঃ) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তার স্বামী ইয়াসির (রাঃ) এবং সন্তান আম্মার (রাঃ)-সহ ইসলাম গ্রহণ করেন, যা তাদের পুরো পরিবারকে ইসলামের প্রতি অবিচল করে তোলে।

অত্যাচার ও নির্যাতন:

ইসলাম গ্রহণের পর, সুমাইয়া (রাঃ) ও তার পরিবার মক্কার কুরাইশ নেতাদের কাছ থেকে চরম নির্যাতনের শিকার হন। যেহেতু তারা ক্রীতদাস এবং আর্থিকভাবে দুর্বল ছিলেন, মক্কার ক্ষমতাধর কুরাইশরা তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়। আবু জাহল, যিনি ইসলামের তীব্র বিরোধী ছিলেন, বিশেষভাবে সুমাইয়া (রাঃ)-এর ওপর নির্যাতন চালাতেন।

তাকে এবং তার পরিবারকে মরুভূমির প্রখর রোদে ফেলে অত্যাচার করা হতো। তাদের বলা হতো, ইসলাম ত্যাগ করে মূর্তিপূজায় ফিরে যেতে। কিন্তু সুমাইয়া (রাঃ) ও তার পরিবার ইসলামের প্রতি তাদের ঈমান থেকে একচুলও বিচ্যুত হননি।

শহীদ হওয়ার ঘটনা:

নির্যাতনের একপর্যায়ে আবু জাহল তার ওপর এতটাই নির্মম অত্যাচার চালান যে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আবু জাহল একটি বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত করেন, যার ফলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার এই আত্মত্যাগ তাকে ইসলামের প্রথম নারী শহীদ হিসেবে ইতিহাসে অমর করেছে।

ইতিহাসে তার অবদান:

সুমাইয়া (রাঃ)-এর ত্যাগ ও ধৈর্য ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ। তিনি দেখিয়েছেন, সত্যের পথে থাকা এবং ঈমানের জন্য জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকা একজন মুসলমানের গুণ।

পঞ্চম অধ্যায়:সভ্যতার বিকাশ, গতি সঞ্চার, সভ্যতা সংরক্ষণ

সভ্যতার বিকাশে নারীর ভূমিকা

সভ্যতার বিকাশ

সভ্যতার বিকাশে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত নারীরা সমাজের বিভিন্ন স্তরে তাদের অবদানের মাধ্যমে সভ্যতার বিকাশ করে যাচ্ছে। নারী শুধু মাত্র সন্তান লালন - পালন আর সংসারর সমস্ত কাজ করেই দিনানিপাত করে না। বরং তার জ্ঞান গরিমা দিয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবদান রাখে। নারী ধর্মীয় আবহে, শরয়ি পর্দায় থেকেই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে, রাজনীতিতে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

নারীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো মানবসভ্যতা বিনির্মাণ। অর্থাৎ একজন নারী একটি শিশু ভূমিষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে, লালন-পালন, শৈশব, কৈশোর ইত্যাদি বয়সে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর একজন নারী তার সেই সন্তানের স্বভাব প্রকৃতি যেভাবে বুঝতে পারেন তা অন্য কেউ বুঝতে পারে না। ভূমিষ্ঠ সন্তান পৃথিবীতে অচেনা মুসাফিরের মতো। মুসাফির যেমন অচেনা অপরিচিত যায়গায় অন্যের দিকনির্দেশনা ছাড়া চলতে পারে না তেমনি সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া মানবশিশুও এ পৃথিবীতে একজন নতুন মুসাফির। দুনিয়ার জীবনাচার, জীবনের পথ-ঘাট সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা। এসময় তার পিতামাতাই প্রধান পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ সময় পিতা মাতা সন্তেনকে যে পথ দেখাবে ভবিষ্যতে সন্তান সে পথেই চলবে আশা করা যায়। পিতামাতা যদি সন্তানকে ভালো পথে পরিচালিত করে তাহলে সন্তান সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। আর পিতামাতা যদি সন্ধানকে ভুল পথ দেখায় তাহলে সন্তান ভুল পথে চলে তার মূল্যবান জীবন বিনষ্ট করে দেয়।

শিশু মনে ঈমানের মজবুত ভিত স্থাপন

শিশুকালীন শিক্ষাদীক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এসময় যা শেখানো হবে শিশুমনে তা গেথে থাকে সারাজীবন। শিশু অবস্থায় যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা সারা জীবন কাজে লাগে। আর এ শিক্ষা দেওয়ার কাজে নারীর ভূমিকা অপরিসীম। একটি শিশু তার জন্মের পর ৮-১০ বছর পর্যন্ত মায়ের সাথে থাকে । এসময় মায়ের আচার-আচরণ, পারিবারিক কৃষ্টি-কালচার শিশুর চরিত্র গঠনে কাজ করে।

শিশুর মা অর্থাৎ মা সহ পরিবারের বাকি সবাই যদি ইসলামী ভাবধারায় পরিচালিত হয়ে থাকে তাহলে শিশুটি আজীবন ইসলামী ভাবধারায় জীবন পরিচালিত করবে। কারন শিশু বয়সে পাওয়া শিক্ষা সে সারা জীবন ধরে রাখবে। এক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবারের পাশাপাশি চারপাশের পরিবেশের দিকেও নজর রাখতে হবে। কারন শিশু শুধুমাত্র পরিবারে আটকে থাকবে না। বাইরের পরিবেশ খারাপ হলে এর স্বভাব শিশুটির উপরও পরবে। তাই পরিবারের পাশাপাশি বাইরের পরিবেশেকে ইসলামী ভাবধারায় গঠন করতে হবে।

শিশু পরিণত বয়সে পৌঁছানোর পর তার ছোট্ট গন্ডি পেরিয়ে জগত সংসারের বৃহৎ গণ্ডির মধ্যে এসে পরে। তিখন চারপাশের নোংরা খারাপ দিক একে সহজেই প্রভাবিত করে ফেলতে পারে। কিন্তু শৈশবে পাওয়া তার মা এবং পরিবারের শিক্ষা তাকে এসব থেকে মুক্ত রাখতে পারে। একজন মা তার শিশু সন্তানের মনে ঈমানকে এমন ভাবে গেথে দেন যেন তার শিশু সন্তান বড় হয়েও ইসলামী সভ্যতা টিকিয়ে রাখে।

সন্তানের চরিত্র গঠনে মা এবং বাবার যৌথ চেষ্টা প্রয়োজন। সন্তানের চরিত্র গঠনে পিতামাতার এ প্রচেষ্টা কৃষকের ফসল ফলানোর সাথে সাদৃশ্য। কৃষক যেমন শস্যক্ষেত্রে বীজ বপন করার পর তার দায়িত্ব থাকে শস্যক্ষেত্রটি সকল বিপদ-আপদ থেকে বাচিয়ে বীজ থেকে ফসল উৎপাদন করা। তেমনি ভাবে একজন পিতা তার অনাগত সন্তানের জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহন করে। তার স্ত্রী যেন নিরাপদে সু-সন্তান প্রসব করতে পারে সেদিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখে। 'ফসল উৎপাদনে ও ফল প্রদানে কৃষকের হাত থাকে না। বরং তা নির্ভর করে মাটির গুনাবলীর উপর । মাটি ভালো হলে ফসল ভালো হয় আর মাটি ভালো না হলে ফসল ভালো হয়না। একই ভাবে সন্তান প্রসব থেকে শুরু করে সন্তানের লালন-পালন, চরিত্র গঠন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সরাসরি পুরুষের হাত থাকে না। এটি নারী চরিত্রের উপর নির্ভর করে। নারী যদি মহৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে সে মানব সভ্যতা বির্নিমানে প্রকৃত যোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রে তার গর্ভের সন্তান ও অনুরূপ হবে বলে আশা করা যায়।

-আলোকিত সমাজ নির্মাণ করতে হলে' আগে পরিবারে ইসলামের রূপরেখা অনুযারী চালাতে হবে। আর এজন্য দরকার উত্তম ও মহৎ গুনের অধিকারী নারী সদস্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটি শিশু তার শৈশবে যে শিক্ষা পায় তা তার সারাজীবন পরিচালিত করে থাকে,

একজন মানুষ নীতি নিতিকতা, সভ্যতার শিক্ষাও লাভ করে থাকে শৈশবে। এ সময় তার প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা মা পালন করে থাকেন। মা যদি শৈশবকালেই সন্তানকে পালন করে থাকেন, ন্যায়পরায়ণতা শিক্ষা দেন তাহলে ভবিষ্যতের শিশু আগামীর পৃথিবীতে সভ্য হিসাবে বিচরণ করবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় মানবসভ্যতার জন্মদান ও বিকাশের ক্ষেত্রে নারী জাতি মানব সদস্যের উপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূর প্রসারী ভূমিকা রাখে।

আসলাফের কিছু দৃষ্টান্ত : সন্তানের দ্বীনি শিক্ষায় মায়ের ভূমিকা

সন্তানের লালন-পালন ও উত্তম চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মায়ের কোল প্রতিটি সন্তানের প্রথম পাঠশালা। মায়ের কাছেই সন্তান গ্রহণ করে জীবনের প্রথম পাঠ। মায়ের ভাষাতেই ফোটে সন্তানের প্রথম কথা। মায়ের আচরণ থেকেই সে শিখে জীবন যাপনের নিয়ম। শৈশব-কৈশোরে সন্তানের মধ্যে যে স্বভাব-চরিত্র গড়ে উঠে, সেটাই তার জীবনের শেকড় ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এরপর যখন সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, তখন কৈশোরে গড়া সেই ভিত্তিই তার জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাই সন্তানের উষালগ্ন হতে যদি তাকে সঠিক তরবিয়ত দেয়া না হয়, উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দায় গড়ে তোলা না হয়, তাহলে পরে আর কোনো পন্থাই কার্যকর হয় না।

প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জানা থাকা উচিত, আমাদের আসল পরিচয় আমরা মুসলমান। আমাদের মূল ঠিকানা ও আসল গন্তব্য পরকাল। সুতরাং পার্থিব চাহিদা, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের অভিলাষ এবং তথাকথিত আধুনিকতার স্রোতে আমরা যেন আমাদের পরিচয় ভুলে না যাই। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার আবশ্যিক কর্তব্য হবে তাদের সন্তানদের দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করা। তাদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার পরিচয় গেঁথে দেয়া। তাওহীদ ও রিসালাতের বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করা। কারণ সন্তান হয়ত প্রত্যাশামত দুনিয়ার সব কিছুই পেল। ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের সব উপকরণই অর্জন করল। কিন্তু সে আল্লাহকে পেল না, পরকাল চিনল না, মনে রাখতে হবে সে কিছুই পেল না।

যে পিতামাতা তাদের সন্তানদের আখেরাত ধ্বংস করল, মুসলমান হয়েও সন্তানকে মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ দিল না সেই মা-বাবা সন্তানের মৌলিক অধিকার রক্ষা করল না, তাদের আসল দায়িত্বই পালন করল না। তারা হলেন জালিম আর সন্তান হল মাজলুম।

জীবনী ও ইতিহাসগ্রন্থে আমাদের আকাবির-আসলাফের এমন হাজারো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে সন্তানকে জিহাদের ময়দানে এবং হিজরত ও দ্বীনের দাওয়াতে প্রেরণে আর দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করণে শুধু মায়েরাই বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। এখানে সে রকম কয়েকটি ঘটনা পেশ করছি।

উম্মে আনাস ইবনে মালেক রা. হযরত আনাস রা. বলেন, হযরত আবু তালহা রা. উম্মে সুলাইমকে বিবাহের

প্রস্তাব দিলেন। উম্মে সুলাইম বলেন, আমার ছেলে আনাস প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এবং ইলমের মজলিসগুলোতে না বসা পর্যন্ত আমি বিবাহ করবো না। হযরত আনাস রা. বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার আম্মাকে উত্তম বিনিময় দান করুন তিনি আমাকে উত্তমভাবে লালন-

পালন করেছেন। হযরত আনাস রা. ইলম শেখা আরম্ভ করার পর তিনি আবু তালহা রা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।-তবাকাতে ইবনে সা'দ ৮ : ৩১১

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আনাস রা. যখন দশ বছর বয়সে উপনীত হলেন, তার আম্মা হযরত উম্মে সুলাইম তাকে নিয়ে রাসূলের দরবারে আগমন করলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আমার ছেলে আনাস। আজ থেকে আপনার খেদমত করবে। তখন থেকেই আনাস রা. নিয়মিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমত করেছেন এবং আল্লাহর রাসূলের খাদেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। প্রাগুক্ত

উম্মে সুফিয়ান সাওরী : হযরত ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রাহ. বলেন, সুফিয়ান সাওরীর আম্মা তার পুত্র সুফিয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, হে বৎস! তুমি ইলম অর্জন করো। আমি সুতাকাটার বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পাব তা দিয়ে তোমার লালন-পালন ও ব্যয়ভার বহন করার জন্য যথেষ্ট হবো। হে আমার পুত্র ! তুমি দশটি হাদীস লেখার পর দেখ, তোমার মধ্যে জ্ঞানার্জনের চাহিদা, সহিষ্ণুতা, শিষ্টতা ও গাম্ভীর্য বেড়েছে কি না , তোমার মধ্যে যদি এ ক্ষেত্রে কোনো উন্নতি না ঘটে, ইলমের চাহিদা বৃদ্ধি না পায়, তবে মনে রেখ এটা তোমার উপকার-অপকার, লাভ-ক্ষতি কিছুই করবে না।-তারিখে আবুল কাসেম জুরজানী

উম্মে রবীআতুর রাঈ

হযরত আদুল ওয়াহহাব ইবনে আতা রহ. বলেন, রবীআর পিতা আবু আবদুর রহমান-যার আসল নাম ফররুখ-বনু উমাইয়ার শাসনামলে একজন সৈনিক হিসেবে খোরাসানের যুদ্ধে যান। রবীআ তখন তার মায়ের গর্ভে ছিলেন। যাওয়ার সময় উম্মে রবীআর নিকট ত্রিশ হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) রেখে যান। সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। পিতা ফররুখ ঘরে প্রবেশ করলেন। এখানে পিতা-পুত্রের অপরিচিতিজনিত একটি সুন্দর ঘটনা আছে। এরপর পুত্র রবীআর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ-ই আমার ছেলে? স্ত্রী বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, যাওয়ার সময় তোমার কাছে যে সম্পদ (দীনার) রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো বের করে দাও। স্ত্রী বললেন, এগুলো আমি সংরক্ষণ করেছি। এখনই তা জানতে পারবেন।

তারপর পুত্র রবীআ মসজিদে গমন করলেন। যথারীতি তার মজলিসে গিয়ে বসলেন। ইমাম মালেক, হাসান ইবনে যায়দ, ইবনু আবু আলী লাহাবী ও মদীনার অন্যান্য গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উম্মে রবীআ স্বামীকে বললেন, যান, মসজিদে নববীতে গিয়ে নামায পড়ে আসেন। তিনি মসজিদে এসে নামায পড়লেন। অতঃপর লোকজনে ভরপুর মজলিসের দিকে তার নজর পড়লো। তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। তারা তার জন্য একটু জায়গা প্রশস্ত করে দিলেন। রবীআ এমনভাবে মাথানত করে রাখলেন, যেন তিনি তাকে (পিতা) দেখেননি। তার দেহ চাদর আবৃত ছিলো। পিতা ফররুখ কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আল্লাহ তাআলা সন্তানকে অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন।

তারপর পিতা ঘরে ফিরে গেলেন এবং ছেলের মাকে বললেন, আজ তোমার ছেলেকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলাম, যে অবস্থানে কোনো আলেম বা মুফতীকে দেখতে পাইনি। উত্তরে তার আম্মা বললেন, এবার বলুন, আপনার নিকট কোনটি বেশি প্রিয়-ত্রিশ হাজার দীনার, নাকি সন্তানের এই উচ্চ মর্যাদা। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! সন্তানের এই মর্যাদাই আমার কাছে প্রিয়। উম্মে রবীআ বললেন, আপনার রেখে যাওয়া সব দীনার তার জন্যই ব্যয় করেছি। পিতা বললেন,

আল্লাহর কসম! তুমি তা অনর্থক কাজে নষ্ট করনি।

উম্মে মালেক ইবনে আনাস : ইমাম মালেক রহ. তখন কিশোর। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাই তার গান শেখার ইচ্ছে হল। মাকে গান শেখার কথা বললেন। তাঁর আম্মা তাকে বললেন যে, তুমি তো গায়কদের মতো সুন্দর নও। গায়ক যদি দেখতে সুন্দর না হয় তাহলে মানুষ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং তুমি গানের চিন্তা বাদ দিয়ে ফিকহ অর্জন কর। ইমাম মালেক রহ. বলেন, তখন আমি গায়কদের পরিত্যাগ করে ফুকাহাদের অনুসরণ করলাম। ফলে

আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন অবস্থানে পৌঁছিয়েছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মা তার মাথায় টুপি পরিয়ে দিলেন এবং তার উপর ধবধবে সাদা একটি পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বললেন, যাও! এখন তুমি রবীআতুর রাঈ-এর মজলিসে গিয়ে বস। তার নিকট থেকে ইলম শেখার পূর্বে আদব শেখ। ইমাম মালেক তার সান্নিধ্যে থেকে ফিকহ ও হাদীস অর্জন করেন। তিনি বলতেন, রবীআর মৃত্যুর পর থেকে ফিকহের স্বাদ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

-তারতীবুল মাদারিক ১/১১৯; তানভীরুল হাওয়ালিক ১৬৪

সভ্যতার গতিসঞ্চার

নাবী- পুরুষ মিলে একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকেই সভ্যতার সৃষ্টি। সভ্যতার গতি সঞ্চারে নারী পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। নারী সব ধরনের কাজ করতে পারে না। কিছু ক্ষেত্রে তাকে পুরুষের দারস্থ হতে হয়। নারী পুরুষ একে অপরের প্রতিযোগি নয় বরং সহযোগী হয়ে কাজ করলে তা সহজেই সম্পাদন করা সম্ভব। সভ্যতার গতি সঞ্চার নারী এবং পুরুষ জাতির অবদানে হয়ে থাকে তাই নিম্নে নারী ও পুরুষ জাতির পারস্পারিক সহযোগী হয়ে কিভাবে সভ্যতার গতিসঞ্চার হয় তা আলোচনা করা হল।

সমাজসভ্যতা বিনির্মাণে পুরুষ

একটি সফল ও টেকসই সভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নারীকে যেমন কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয় তেমনিভাবে পুরুষকেও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। নারীর দায়িত্ব হয় মানবসভ্যতা বিনির্মাণ আর পুরুষের দায়িত্ব হয় সমাজসভ্যতা বিনির্মাণ। মানবসভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে নারীকে যেমন মানবসত্তাকে নিয়ে কাজ করতে হয়; কীভাবে তার উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন করা যায়-সে লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয় তেমনিভাবে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণের ক্ষেত্রেও পুরুষকে সমাজ নিয়ে কাজ করতে হয়; কীভাবে সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করা যায়-সে লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ নিতে হয়। সমাজের ভারসাম্য রক্ষার জন্য অফিস-আদালত ও হাট-বাজার প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নারী- পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় এভাবেই একটি সফল বিশ্বসভ্যতা বিনির্মিত হয়। পুরুষের এ দায়িত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অতঃপর নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ তালাশ কর ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হও।' (সুরা জুমুআ :১০)

পুরুষের দায়িত্ব যেহেতু সমাজসভ্যতা বিনির্মাণ, তাই এ দায়িত্ব পালন করার জন্য তাকে ঘরের কুসুমাস্তীর্ণ পরিবেশ ছেড়ে সমাজে যেতে হয়। তাতে বিচরণ করতে হয়। সেখানে অবস্থান করে তাকে বিভিন্ন কার্যক্রম আনজাম দিতে হয়। আর এটা আমাদের সকলেরই জানা কথা যে, সমাজ হল ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সভ্য-অসভ্য, নম্র- কঠোর সব ধরনের লোকের সম্মিলনক্ষেত্র। এতে বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার লোক জমায়েত হয়ে থাকে।

তাই সমাজে চলতে গিয়ে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী পুরুষজাতিকে বিচিত্র স্বভাবের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হয়। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করতে হয়। লেনদেন করতে হয়। কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এভাবে বিচিত্র স্বভাবের লোকেদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে গিয়ে কখনো সে কষ্টানুভব করে, কখনো মর্মযাতনায় ভোগে, কখনো তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায়। এসব কারণে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণ করতে গিয়ে পুরুষজাতি প্রায়শই স্বাভাবিক

কর্মচেতনা ও প্রেরণা হারিয়ে ফেলে। তার কাজের গতি মন্থর হয়ে যায়। কখনো বা সে জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই হারিয়ে বসতে শুরু করে।

এমন সময় প্রয়োজন হয় একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর, যে হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে একে একে সব দুঃখ-কষ্ট বিদূরিত করবে। মমতা ও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে হৃদয় ও মন প্রফুল্ল করে তুলবে। আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দেবে দেহ-মনজুড়ে। ফিরিয়ে আনবে পূর্ববৎ কর্মপ্রেরণা, যার ভালোবাসার পরশে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী শ্রেণি নব উদ্যমে, নতুন জীবন নিয়ে ফিরে যাবে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণের সুমহান দায়িত্ব পালনে।

সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারীকে মমতা ও ভালোবাসার স্নিগ্ধ পরশে স্নাত করে নব চেতনা ও নতুন কর্মপ্রেরণা ফিরিয়ে দেওয়া সেই অন্তরঙ্গ বন্ধুই হচ্ছে নারী (স্ত্রী)। নারীর দায়িত্ব হচ্ছে সমাজসভ্যতা বিনির্মাণকারী স্বামীর হৃদয়-মন প্রফুল্ল রাখা। তার যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও টেনশন দূরীভূত করা। স্বামীর সঙ্গে সর্বদা হাসিমুখে কথা বলা। স্বামী যেন ঘরে এসে প্রশান্তি খুঁজে পায় সে রকম প্রস্তুতি নিয়ে রাখা।

মানবসভ্যতা বিনির্মাণকারী নারীজাতির তৃতীয় এই দায়িত্ব কুরআন নিম্নযুক্ত ভাষায়
ব্যক্ত করেছে:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"তার এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার। আর তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও মমতা তৈরি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" (সুরা রুম :২১)

অন্য আয়াতে এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্তা থেকে; আর তার থেকেই তার স্ত্রী তৈরি করেছেন, যাতে তার কাছে শান্তি লাভ করতে পারে" (সুরা আরাফ :১৮৯)

সভ্যতার সংরক্ষন

মানবসভ্যতা নির্মানে নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সন্তান জন্মদান, লালন-পালন, শিশুমনে ঈমানের মজুবত ভিত স্থাপন সজতার গতি সঞ্চারে, এবং সবশেষে সভ্যতাকে সংরক্ষন করার মাধ্যমে নারী জাতি সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সভ্যতা সংরক্ষন করতে নারীর পর্দার পরিবেশ থেকে বাহির হতে হয় না। দারের মধ্যে পর্দায় থেকেই নারী সভ্যতাকে ভালোভাবে সংরক্ষন করতে পারে। পূর্বে নারীকে মালীর • সাথে সাদৃশ দেখানো হয়েছিল। মালী যেমন একটি বীজ • থেকে পরিপূর্ণ গাছ তৈরিতে সুনিপুন পরিচর্যার মাধ্যমে তাকে বড় করে তোলে তেমনি নারীও অনুরূপ ভাবে একটি ছোট্ট ভ্রুন থেকে ধীরে ধীরে একটি মানব শিশুর জন্ম দেয় এবং তার লালন-পালন করে বড় করে তোলে। মালী যেমন এক আঘাতে তার এত দিনের কষ্টের ফসল নষ্ট করে ফেলতে পারে একই ভাবে একজন নারীও ইচ্ছা করলে দীর্ঘদিনের পরম কষ্টে গড়ে তোলা মানব সভ্যতাকে বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। ধধ্বংস করে দিতে পারে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

ঘর থেকে বাহির হলেই তা নারীর জন্য অনিরাপদ এবং তা নারীকে ধ্বংস করে ফেলতে যথেষ্ট। এ কারণে 'ইসলাম নারীকে গৃহে অবস্থান করতে বলেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন..

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে মূর্খতাযুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।' (সুরা আহযাব :৩৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان

নারী হচ্ছে আবরণীয় সত্তা। সে যখন বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি চোখ তুলে তাকায়। (সুনানে তিরমিজি- ১১৭৩)

উপর্যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম নারীকে মানবসভ্যতা, রক্ষকের মর্যাদার অধিষ্ঠিত করেছে। নারীর মান-মর্যাদা উঁচু করেছে। এই মান অক্ষুন্ন রাখতেই নারীকে তার প্রযোজন ব্যতীত ঘর থেকে বাহির হওয়ার অনুমতি দেয়না। নারীদের সকল প্রয়োজন পূরণ করার দায়িত্ব পিতা, স্বামী, ভাই এবং ছেলের কাধে অর্পন করা হয়েছে।

এমনকি নারীকে ইবাদাতের জন্য মসজিদে যাওয়াকেও নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। নারী কঠোরভাবে পর্দা করে গেলেও তাকে বাহিরে আসার অনুমতি ইসলাম দেয় না। ইসলাম নারী জাতিকে ঘরে রাখার মাধ্যমে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করছে।

পর্দার ক্ষেত্রে ইসলামের উল্লিখিত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আঁচ করা যায় যে, শুধু শরীর ও চেহারা ঢাকার নামই পর্দা নয়; বরং পর্দা হচ্ছে এক উন্নত সংস্কৃতির নাম। এক মহান আদর্শের নাম। যার মধ্যে গোটা মানবজাতিকে রক্ষার এক অনন্য দর্শন নিহিত রয়েছে। ইসলাম এর

মাধ্যমে মানবসভ্যতা রক্ষার সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে। দুঃখের বিষয় হচ্ছে, ইসলামের এ সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি পশ্চিমা সমাজ তো বটেই; এমনকি আমাদের ইসলামি সমাজের কিছু গবেষকেরও দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তারা এক্ষেত্রে মারাত্মক হোঁচট খেয়েছেন। পর্দাকে তারা দেহ ও মুখ ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে ফেলেছেন।

উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম মানবসভ্যতার সুরক্ষা ও তা সংরক্ষণের জন্য ইসলাম নারীর যাবতীয় প্রয়োজন পুরুষের কাঁধে অর্পণ করে ঘরের কুসুমাস্তীর্ণ পরিবেশে তার বিচরণ সীমাবদ্ধ করেছে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তাকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছে। আর যখন বের হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন আপাদমস্তক (চেহারাসহ) অনাকর্ষণীয় কাপড় দ্বারা নিজেকে আবৃত করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِن َّ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِين َ
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের (মুখের) উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।' (সুরা আহযাব :৫৯)

সভ্যতার সংরক্ষণে নারী পুরুষ সহযোগী হয়ে কাজ করলে নারী ঘরে থেকেই তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে আর যা সে ঘরে থেকে পারবে না সেই দায়িত্ব পুরুষ পালন করবে। এভাবে নারীর পর্দার হেফাজত হবে এবং সভ্যতারও সংরক্ষণ হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীর ভূমিকা

রসূলের যুগে মুসলিম নারীর বিভিন্ন সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণের ঘটনাবলী

এক. মসজিদকেন্দ্রিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ

ক. ইবাদতমূলক তৎপরতার উদাহরণ

"আসমা বিনতে আবু বকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সূর্যগ্রহণ হলো... আমি আমার প্রয়োজন সেরে এসে মসজিদে প্রবেশ করে দেখলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও তাঁর সাথে দাঁড়ালাম। তিনি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন এমনকি আমি আর পড়তে মনস্থ করলাম। কিন্তু তারপর এক দুর্বল মহিলাকে দেখতে পেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, এতো আমার চেয়ে দুর্বল (সে তো দাঁড়িয়ে আছে)। তাই আমিও দাঁড়িয়ে থাকবো। অতপর তিনি রুকু করলেন এবং দীর্ঘক্ষণ রুকুতে থাকলেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠালেন এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। এমনকি সেই সময় যদি কেউ এসে দেখতো তাহলে তার ধারণা হতো যে, তিনি রুকু' করেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শেষ করলেন তখন সূর্য গ্রহণমুক্ত হয়েছে। তখন তিনি লোকদের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, 'আম্মা বা'দ...।" (বুখারী ও মুসলিম, এটি মুসলিমের বর্ণনা)

খ. সাংস্কৃতিক তৎপরতার উদাহরণ

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, অতপর আমি মসজিদে গিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামাজ পড়লাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে হাসতে হাসতে মিম্বরে বসলেন। তিনি বললেন, প্রত্যেকেই নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকো। তারপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি কেন তোমাদের সমবেত করেছি? সবাই বললো, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের কোন উৎসাহব্যঞ্জক বা ভীতিকর খবরের জন্য সমবেত করিনি। বরং এ উদ্দেশ্যে সমবেত করেছি যে, তামীমে দারী নামক এক ব্যক্তি আমার কাছে এসেছে। সে ছিল একজন খৃষ্টান। সে আমার কাছে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছে যা আমি মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে তোমাদের ইতিপূর্বে যে কথা বলেছিলাম তার সাথে হুবহু মিলে যায়...।" (মুসলিম) ১খ

গ. বিনোদনমূলক তৎপরতার উদাহরণ

ঈমানদার নারীদের সাথে অবসর সময় কাটান

"রুবাইয়ে' বিনতে মুআওয়েয ইবনে আফরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: আশূরার দিন প্রত্যুষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের জনপদে লোক পাঠিয়ে এ মর্মে ঘোষণা করলেন যে, যারা সকালে আহার করেছে তারা দিনের অবশিষ্টাংশে কিছু খাবে না। আর যারা রোযা রেখেছে তারা রোযা পূর্ণ করবে। হাদীস বর্ণনাকারিণী রুবাইয়ে' বিনতে মুআওয়েয বলেন, এরপর থেকে আমরা রোযা রাখতাম এবং আমাদের শিশু সন্তানদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা রঙিন পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। মুসলিমের একটি বর্ণনায় আছে: এবং আমরা মসজিদে যেতাম। তারা (শিশুরা) খাবার চাইলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম, যাতে তাদের রোযা পূর্ণ হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

দুই. সাধারণ অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ

ক. সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"আবুবকর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... আমরা রাতের বেলায় মদীনায় এসে পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কার বাড়িতে অতিথি হবেন এ বিষয়ে মদীনাবাসী মুসলমানগণ বিতর্কে লিপ্ত হলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকূল বনী নাজ্জার গোত্রে উঠবো এবং এভাবে তাদেরকে সম্মানিত করবো। নারী ও পুরুষরা তাদের ঘরের ছাদে উঠলো এবং ছোট ছোট শিশু ও খাদেমরা রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ে ডাকতে শুরু করলো। হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল! হে মুহাম্মদ! হে আল্লাহর রসূল!" (মুসলিম) ২ক

খ. ঈদের অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে ঈদের দিন বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হতো। আমরা কুমারী মেয়েদেরকেও তাদের নিভৃত কক্ষ থেকে বের করে আনতাম; এমনকি ঋতুবতীদেরকেও বের করে আনতাম। তারা লোকদের পেছনে থাকতো। লোকেরা তাকবীর বললে তারাও তাকবীর বলতো এবং তাদের সাথে দোয়ায় শরীক হতো। এভাবে সবাই ঐ দিনের কল্যাণ ও পবিত্রতা লাভের আশা করতো।" (বুখারী ও মুসলিম) ২খ

গ. বিবাহ অনুষ্ঠানের উদাহরণ

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমার মা উম্মে রূমান আমার কাছে আসলেন.... অতপর তিনি আমাকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। ঘরের মধ্যে কিছুসংখ্যক আনসার মহিলা ছিলেন। তারা বললেন, আগমন কল্যাণ ও বরকতময় হোক এবং ভবিষ্যত জীবনে উত্তম অংশ লাভ করো। তিনি (আমার মা) আমাকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা আমার সবকিছু ঠিকঠাক করলেন। অতপর দুপুরের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনই কেবল আমাকে সচকিত করে তুললো। তারা (আনসার মহিলারা) তখন আমাকে তাঁর কাছে সোপর্দ করলেন......।" (বুখারী ও মুসলিম)

চার. আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর কাজ করা

মহান আল্লাহ বলেন:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُہُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَہٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُہُمُ اللهُ ؕ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"(সূরা আত-তাওবা ৯:৭১)

আল্লামা রশীদ রেযা বলেন, এ আয়াতে নারী ও পুরুষের ওপরে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার" (ভাল কাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা)-এর কাজ ফরয করে দেয়া হয়েছে। কিভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে নারীরা তা শিখতো এবং সে অনুপাতে কাজ করতো। নারীরা যে 'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের কাজ শিখতো এবং সে অনুপাতে আমল করতো তা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে ইয়াহইয়া ইবনে আবু সুলাইম থেকে তাবারানী বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত দ্বারা। তিনি বর্ণনা করেছেন, আমি দেখলাম সামরা বিনতে নাহীক- তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছিলেন- মোটা কামিজ ও দোপাট্টা পরিধান করে মানুষকে শিষ্টাচার শেখাচ্ছেন। ভাল কাজের আদেশ দিচ্ছেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করছেন। (তাবারানী)

স্বেচ্ছায় সমাজসেবা ও কল্যাণমূলক কাজ করা

ক. মুহাজিরদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা

"আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যখন মুহাজিরগণ মক্কা থেকে মদীনায় আগমন করলেনখন তাদের হাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু আনসারগণ ভূমির মালিক ছিলেন। আনসারগণ এই শর্তে তাদের ভূমি মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন যে, প্রতিবছর তার উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) দেয়া হবে। এর বিনিময়ে মুহাজিরগণ কেবল কাজ ও শ্রম দান করবেন... আনাস ইবনে মালেকের মা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়েকটি খেজুর গাছ (খেজুর ভোগ করার জন্য) দিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার তা তাঁর আযাদকৃত দাসী উম্মে আয়মানকে অর্থাৎ উসামা ইবনে যায়েদের মাকে দিয়েছিলেন।..." (বুখারী ও মুসলিম)

খ. জ্ঞানী ও মর্যাদাবান লোকদের আপ্যায়ন

"ফাতেমা বিনতে কায়েস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, তুমি উম্মে শারীকের কাছে চলে যাও। উম্মে শারীক ছিলেন একজন ধনাঢ্য আনসার মহিলা। তিনি আল্লাহর পথে প্রচুর দান খয়রাত করতেন। তার কাছে অনেক মেহমানের আনাগোনা হতো... আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি তাই করবো। তিনি বললেন, তা করার দরকার নেই। কারণ উম্মে শারীক এমন একজন মহিলা যার কাছে যথেষ্ট সংখ্যক মেহমান এসে থাকেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, ১৩ উম্মে শারীকের কাছে প্রথম যুগের মুহাজিররা এসে থাকে।" (মুসলিম)

গ. মসজিদের মিম্বর দান

"জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। এক আনসারী মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আপনাকে এমন কিছু (আসন) তৈরী করে দেব, যার ওপর আপনি বসবেন? ... সে তাঁর জন্য মিম্বর তৈরী করে দিল। পরে জুমআর দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ মিম্বরের ওপর বসলেন।” (বুখারী)

ঘ. স্বেচ্ছায় মসজিদ পরিষ্কার করা

"আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক মসজিদ ঝাড়ু দিতো। (বুখারীর একটি বর্ণনায় আছে : ১৬ আমি মনে করি সে ছিল একজন মহিলা)। সে মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিলেন। সবাই বললেন, সে মারা গেছে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন? আমাকে তার (পুরুষ) কবর দেখিয়ে

দাও অথবা বললেন, ঐ মহিলার কবর দেখিয়ে দাও। তিনি ঐ মহিলার কবরে জানাযা পড়লেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, মহিলাটি মসজিদের জন্য যে খেদমত দান করলেন তা জায়েয। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই খেদমতকে স্বীকৃতি দান করেছেন।

ঙ. স্বেচ্ছায় রোগীর সেবা করা

"খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবেত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উম্মুল আ'লা নাম্নী একজন আনসার মহিলা যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাইয়াত করেছিলেন- তাকে বলেছেন যে, মুহাজিরদের বাসস্থানের ব্যাপারে আনসাররা লটারী করলে উসমান ইবনে মাযউনের বাসস্থানের বিষয়টি তাদের ভাগে পড়লো। উম্মুল আলা বলেন, আমাদের কাছে থাকা অবস্থায় উসমান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থ অবস্থায় আমি তাকে দেখাশোনা করতে থাকলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মারা গেলেন। আমরা তার (ব্যবহার্য) কাপড় দিয়ে তাকে কাফন দিলাম...।" (বুখারী)

চ. যুদ্ধের পর আহতদের সেবাযত্ন করা

"আবু হাযেম সাহল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, সাহল ইবনে সা'দকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহত হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল। জবাবে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! সেই সময় কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জখম ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং কে পানি ঢালছিলেন তা আমি অবশ্যই জানি। আর যা দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছিল তাও আমি জানি। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা (ফাতেমা) তা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং আলী ঢালে করে পানি এনে ঢালছিলেন। ফাতেমা যখন বুঝলেন যে, পানি ঢালায় রক্ত বন্ধ না হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি একখন্ড চাটাই নিয়ে পুড়িয়ে তার ছাই জখমের ওপর লাগিয়ে দিলেন। এতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ঐদিন (ওহুদ যুদ্ধের দিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের (ডানদিকের) দাঁত ভেঙে গিয়েছিল, মুখমন্ডল যখম হয়েছিল এবং শিরস্ত্রাণ ভেঙে গিয়েছিল।" (বুখারী ও মুসলিম)

পুরুষদের সাথে সাক্ষাত ছাড়াই নারীর সামাজিক তৎপরতার কতিপয় ঘটনা

ক. কল্যাণমূলক কাজে দান

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় স্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম আপনার সাথে মিলিত হবে (মৃত্যুবরণ করবে)? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যার হাত সবচাইতে লম্বা। তখন তারা একটি কাঠি নিয়ে মেপে দেখলেন যয়নাবের হাত সবচাইতে লম্বা। পরে আমরা (যয়নাব বিনতে জাহাশের মৃত্যুর পর) বুঝতে পারলাম যে, তাঁর হাত লম্বা হওয়া দ্বারা তাঁর অধিক দান খয়রাতের কথা বলা হয়েছে। আর আমাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দান-খয়রাত করতে পছন্দ করতেন। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে, ২২ তিনি সব সময় নিজেকে এমন কাজে ব্যাপৃত রাখতেন যার উপার্জন থেকে দান-খয়রাত করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে পারেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

عن جابر قال ... فاتى رسول الله صلي الله عليه وسلم امرأته زينب
وهي تمعس منيئة لها

"জাবের থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী যয়নাবের কাছে গেলেন। যয়নাব তখন একখন্ড চামড়া পাকা করছিলেন...।" (মুসলিম)

হাফেজ ইবনে হাজার বলেছেন, ... হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে আয়েশা থেকে বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বলেছেন, যয়নাব ছিলেন একজন হস্তশিল্পী মহিলা। তিনি চামড়া পাকা করতেন, সূচীকর্ম করতেন এবং এভাবে উপার্জিত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। হাকেম মুসলিমের শর্ত অনুসারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

খ. প্রতিবেশীদের খেদমত করা

"আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যুবায়ের যখন আমাকে বিয়ে করেন তখন একটিমাত্র পানিবাহক উট ও একটি ঘোড়া ছাড়া তার কোন প্রকার জায়গা-জমি, অর্থ-সম্পদ বা দাস দাসী কিছুই ছিল না। আমি তার ঘোড়াকে খাদ্য ও পানি দিতাম, তার পানির মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম এবং আটার খামির তৈরী করতাম। কিন্তু আমি ভাল করে রুটি তৈরী করতে পারতাম না। আমার কয়েকজন আনসার প্রতিবেশিনী আমাকে রুটি তৈরী করে দিতেন। তারা ছিলেন খুবই ভাল মহিলা...।" (বুখারী ও মুসলিম)

গ. পরিধেয় বস্ত্র ধার দেয়া

"আবদুল ওয়াহেদ ইবনে আয়মান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে গেলাম। তখন তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের সূতী কামিজ পরিধান করেছিলেন। তিনি বললেন, ... রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমার এরকমই একটা

কামিজ ছিল। প্রয়োজনে লোক পাঠিয়ে আমার নিকট থেকে সেটি ধার না নিলে (বিয়ের জন্য) মদীনার কোন মেয়েকে সাজানোই যেতো না।" (বুখারী ও মুসলিম)

ঘ. নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষাদানে অংশগ্রহণ

"শিফা বিনতে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি হাফসার কাছে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। তিনি আমাকে বললেন,

الا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة؟

"তুমি যেভাবে তাকে লেখা শিখিয়েছো ঠিক তেমনি এই পাঁজরের ঘায়ের চিকিৎসা কি শিখিয়ে দেবে না?" (আহমদ ও আবু দাউদ)

আধুনিক সামাজিক তৎপরতার সংগা এবং সেখানে নারীর ভূমিকা

০ একজন মুসলমানের জন্য সামাজিক তৎপরতা হচ্ছে এমন প্রতিটি কর্মকান্ড যা সংঘবদ্ধভাবে সম্পাদিত হয় এবং যার উদ্দেশ্য হয় সামাজিক জীবনে মানুষের জন্য কল্যাণ সুনিশ্চিত করা, তা সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্যগত, শরীরচর্চাগত, বিনোদনমূলক অথবা সৌন্দর্যমূলক হতে পারে কিংবা দরিদ্রদের জন্য বস্তুগত সাহায্যদানও হতে পারে।

• সামাজিক তৎপরতা এবং মুসলিম নারী ও পুরুষের প্রতিটি তৎপরতা এমনকি বিনোদনমূলক বিষয়টিও ব্যাপক অর্থে ইবাদতের গন্ডিভুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর নির্দেশের সামনে মাথা নত করে দেয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসিত ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তা সম্পাদিত হয়। সেক্ষেত্রে নিয়ত যদি সৎ হয় তবে তা ইবাদত বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে" (আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)

০ সর্বোত্তম সামাজিক তৎপরতা হচ্ছে জনকল্যাণ ও সমাজসেবামূলক কাজ। ব্যক্তির পক্ষ থেকে দরিদ্র ও অভাবীদের সাদকা বা দান হিসেবে সাহায্য দেয়া হলে তারা সেই সাহায্যকে উল্লেখিত ব্যক্তির দয়া ও করুনা হিসেবে মনে করে এবং এতে তাদের মর্যাদাবোধ আহত হয়। কিন্তু সামাজিকভাবে বিভিন্ন সেবার আকারে তাদের এই সাহায্য দেয়া হলে তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

আমাদের যুগে নারীর সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে শরীয়ত
নির্ধারিত কতিপয় দিক-নির্দেশনা

প্রথম দিক-নির্দেশনা

সমাজের কল্যাণকর কাজের জন্য পুরুষের মত নারীকেও আহ্বান জানানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

হে মুমিনগণ! রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করতে পার।" (আল-হজ্জ ২২: ৭৭)

ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় যে কাজই হোক না কেন সকল কাজই তার যথাযথ গুরুত্ব ও নিয়মমাফিক করা প্রয়োজন, যাতে নারী গৃহ ও সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান করে সামাজিক পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সামঞ্জস্য বিধান যে সহজ, সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে সামাজিক তৎপরতার সংগা প্রদানকালেই আমরা ইংগিত দিয়েছি।

মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنۡ ذَكَرٍ اَوۡ اُنۡثٰى وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَاُولٰٓـئِكَ يَدۡخُلُوۡنَ الۡجَـنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ نَقِيۡرًا
আর যে ব্যক্তি সৎকাজ করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে মুমিন হয়ে থাকে, তবে এরূপ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।(সূরা আন নিসা ৪:১২৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেন:

وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ‌ ۘ يَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤۡتُوۡنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيۡعُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهٗ‌ ؕ اُولٰٓـئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ اللّٰهُ‌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيۡزٌ حَكِيۡمٌ
"মুমিন নর ও মুমিন নারী পরস্পরে একে অন্যের সহযোগী। তারা সৎকাজের আদেশ করে, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তারা এমন লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ নিজ রহমত বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (আত্ তাওবা ৯: ৭১)

নারী ও পুরুষকে সমানভাবে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় দিক-নির্দেশনা

সাধারণ অবস্থায় কল্যাণমূলক কাজ করা ও সে জন্য সাহায্য করা 'মানদূব'। তবে কোন সময় তা ফরযে আইন এবং কোন সময় ফরযে কিফায়ার মর্যাদা লাভ করে। তবে সামাজিক অঙ্গনে নারীর জন্য ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রগুলো কি সচেতন মুসলিম নারীর উচিত তা খুঁজে বের করা। এর মধ্যে পড়ে নারী ও অল্প বয়স্কা মেয়েদের যত্ন নেয়া এবং শিশু, বিশেষ করে ইয়াতীম শিশুদের যত্ন নেয়া। সাধারণ অবস্থায় সমাজসেবীদের জন্য প্রতিটি সমাজেই কল্যাণমূলক 'মানদূব' কাজ এবং মানুষের জন্য উত্তম কাজ করার বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে। কল্যাণমূলক সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে সময় ব্যয় ও প্রচেষ্টা চালানো যেমন নারীর জন্য 'মানদূব', তেমনি অর্থ সম্পদ থাকলে তা ব্যয় করাও 'মানদূব'। আর নিজের অর্থ-সম্পদ না থাকলে স্বামীর সম্পদ থেকে তার স্বেচ্ছায় অনুমোদনযোগ্য সীমা পর্যন্ত ব্যয় করাও 'মানদূব'।

"আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! যুবায়ের আমাকে যে মাল দিয়েছে তাছাড়া আমার আর কোন মাল নেই। আমি কি উক্ত মাল থেকে দান করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দান করো; কৃপণতা করে সম্পদ আটকে রেখো না, তাহলে তোমাকে দেয়ার ব্যাপারেও আটকে রাখা হবে। অন্য একটি রেওয়ায়েতে আছে: ৪৯ স্বল্প পরিমাণ হলেও সাধ্যমত দান করো।" (বুখারী ও মুসলিম)

عن عائشة رضى الله عنها قالت : اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها اجره بما كسب .

"আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নারী যখন কোন ক্ষতি (সাংসারিক ব্যয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি) না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে দান করে তখন সে সওয়াবের অধিকারিণী হয়। কারণ সে দান করলো। আর এভাবে তার স্বামীও সওয়াবের অধিকারী হয়। কারণ সে উপার্জন করেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)

সামাজিক তৎপরতার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি ফরযে কিফায়া হিসেবে পরিগণিত সেটি প্রধানত পশ্চাৎপদ সমাজেই দেখা যায়, যেখানে অভাব থাকে তীব্র এবং মানুষের জীবন যাপনের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন থাকে অধিক। এ ধরনের সমাজে মানুষের বদান্যতার মনোবৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সম্মান,, উদারতা ও দয়ার অনুভূতি হ্রাস পায়। পরিতাপের বিষয় যে, এ ধরনের সমাজেই ফরযে কিফায়াসমূহ প্রধানত উপেক্ষিত ও বর্জিত হয়। আমাদের সমাজ যে জিনিসটির বেশী মুখাপেক্ষী তা হচ্ছে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথ ও পন্থা। নারী হোক বা পুরুষ এ সমাজে ব্যক্তি তার নিজের প্রয়োজন ছাড়াও সমাজের প্রতি তার শরীয়ত নির্ধারিত দায়িত্ব সম্পর্কে হবে সচেতন।

তৃতীয় দিক-নির্দেশনা

'মানদূব' জাতীয় সামাজিক তৎপরতায় নারী যখন অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকতে বাধ্য হবে তখন তাকে সাহায্য করা স্বামীর জন্যও 'মানদূব'। কিন্তু নারীর সামাজিক তৎপরতা যদি ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত হয় তাহলে তাকে সাহায্য করাও স্বামীর জন্য ওয়াজিব।

নারীর পেশাগত কার্য শিরোনামে অষ্টম দিক-নির্দেশনায় এ বিষয়ে কুরআন ও
হাদীসের প্রমাণ পূর্বেই পেশ করা হয়েছে।

কিছু পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীস উল্লেখ করেছি যে, 'নারী যখন কোন ক্ষতি (সাংসারিক ব্যয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি) না করে তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী থেকে দান করে তখন সে সওয়াবের অধিকারিণী হয়। কারণ সে দান করেছে। আর এভাবে তার স্বামীও সওয়াবের অধিকারী হয়। কারণ সে উপার্জন করেছে।' (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীসে যা বলা হয়েছে তার ওপর কিয়াস করে আমরা বলতে চাই, নারী যখন কল্যাণকর সামাজিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে এবং সেজন্য কোনো ক্ষতি বা বিপর্যয় সৃষ্টি না করে তার গৃহকর্মের সময় থেকে ব্যয় করে তখন সে তার কাজের বিনিময়ে পুরস্কারের অধিকারিণী হয়। তার স্বামীও পুরস্কারের অধিকারী হয় একদিকে গৃহ তত্বাবধান ও অর্থব্যয়ের কারণে এবং অন্যদিকে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে স্ত্রীর অনুপস্থিতির কষ্ট বরদাশত করার কারণে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইসলামে নারীর অবদান, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি

২. ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভি

৩. মানবসভ্যতা বিনির্মাণে নারী, মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

৪. আল মুহাদ্দিসাত,   ড. মুহাম্মাদ আকরাম নদভি

৫. রসুলের (সা) যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খন্ড, আব্দুল হালিম আবু শুককাহ

-মাসিক আল কাউসার

-গুগল